ইহা ঠিক যে আঙ্গিকের দিক হইতে "তপতী" "রাজা ও রানী" অপেক্ষা দৃঢ় ও সংহত; "রাজা ও রানী"তে যে-তত্ত্বটা লেখক ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন বিক্রম ও সুমিত্রার প্রেমের গতি, প্রকৃতি ও পরিণতির মধ্য দিয়া, তাহা "তপতী"তে সুস্পষ্ট রূপ লইয়াছে, এবং কুমার ও ইলার অপ্রাসঙ্গিক গল্পটা খসিয়া পড়াতে বিক্রম-সুমিত্রার আখ্যানটি স্পষ্টতর হইয়াছে, নাটকটিও সংহত হইয়াছে। কিন্তু ক্ষতিও কি হয় নাই? "রাজা ও রানী"র রানী সুমিত্রা মানবী ছিলেন, মানবীয় দোষগুণে চরিত্রটি ছিল ঘনিষ্ঠতর, নিকটতর: কিন্তু "তপতী"র রানী ত্যাগের কঠোর তপস্যায় মানবীয় দোষগুণ হইতে মুক্ত হইয়া প্রায় যেন দেবীর পর্যায়ে উঠিয়া গিয়াছেন, এবং গল্পবস্তুনিহিত তত্ত্বটি যেন আত্ম-প্রচারে উন্মুখ হইয়াছে। কাজেই একথা মনকে অধিকার করে, জীবনের যে-পর্বে "রাজা ও রানীর 'রূপান্তর ঘটিল' তপতী"তে, রবীন্দ্র-নাট্যের সেই পর্বে কবিচিত্তে তত্ত্বের প্রতি অনুরাগ অনস্বীকার্য, এবং যে-তত্ত্ব "তপতী"তে তাহাই আছে একটু অন্য ভঙ্গিতে "রাজা"য়, ও "অরূপ রতনে"। ত্যাগ ও নিরাসক্তির তপস্যার ভিতর দিয়াই প্রেম ও মিলন হয় পূর্ণ ও সার্থক, ইহার মধ্যে জীবন-দর্শনের কোনও বিরোধিতা নাই; কিন্তু মানুষের মানবীয় কর্মকৃতি লইয়া যে নাটক, সেই ক্ষেত্রে মানুষ তপস্যার আগুনে পুড়িয়া দেবত্ব লাভ করিলে নাটকীয় বস্তু-চেতনা যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়। অথচ প্রতীকী নাট্যে—যেমন "রাজা" ও "অরূপ রতনে"—এই অভিযোগ অবান্তর। "তপতী" নাটকে প্রতীক ধর্মের স্পর্শ লাগিয়াছে অথচ যথার্থ প্রতীকী নাটক হইয়া উঠে নাই। তাহা হইলে বোধ হয় এই অসঙ্গতিটুকু ধরা পড়িত না।

"কালের যাত্রা" ও "চণ্ডালিকা" উভয়ই রূপক নাট্য; প্রথমটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৯'র ভাদ্রে এবং দ্বিতীয়টি ঠিক এক বৎসর পর

১৩৪০'র ভাদ্রে। "কালের যাত্রা"য় দুইটি নাটিকা, একটি 'রথের রশি' আর একটি 'কবির দীক্ষা'। 'রথের রশি'র পূর্বতন রূপ 'রথযাত্রা' প্রকাশিত হইয়াছিল "প্রবাসী"তে ১৩৩০'র অগ্রহায়ণে ; তাহারই একটু পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ 'রথের রশি'। এই ছোট্ট রূপক নাটিকাটি আধুনিক গণসচেতন ভারতীয় মানসের 'ম্যানিফেস্টো'। ভারতবর্ষে মহাকালের রথ অচল হইয়া গিয়াছে; ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার ভারসাম্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে ; পুরোহিততন্ত্র, রাজতন্ত্র, ধনতন্ত্রের হাতে সমাজযন্ত্র চালনার সমস্ত ভার কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে আজ সমাজ রথ অচল। পুরোহিতের মন্ত্র, ক্ষত্রিয়ের শৌর্য, ধনপতির ধনবল কিছুই সে-রথ আর চালাইতে পারিতেছে না—শাস্ত্র, শস্ত্র, ধন সমস্তই আজ অর্থহীন। এমন সময় হৈ হৈ করিয়া আসিয়া পড়িল অগণিত শূদ্রের দল, উন্মত্ত জলস্রোতের মত ; যে শূদ্রের দল এতদিন মহাকালের রথের চাকার তলায় পিষ্ট হইয়া মরিয়া আসিয়াছে আজ তাহারা আসিয়াছে অচল রথ সচল করিতে। অগণিত শূদ্রের অমিত ঐক্যশক্তির বলে রথ চলিল, চলিল চিরাচরিত প্রথাবদ্ধ বাঁধাধরা পথে নয়, নূতন পথে, প্রশস্ততর পথে। শূদ্র শক্তির হইল জয়। এমন সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন কবি। সকলে কবির কাছে এই অপূর্ব অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,

"এ কী উল্‌টাপাল্‌টা ব্যাপার, কবি ? পুরুতের হাতে চল্‌লো না রথ, রাজার হাতে না, মানে বুঝলে কিছু !" কবি বলিলেন, "ওদের মাথা ছিল অত্যন্ত উঁচু, মহাকালের রথের চূড়ায় দিকেই ছিল ওদের দৃষ্টি—নীচের দিকে নামলো না চোখ, রথের দড়িটাকেই করলে তুচ্ছ। মানুষের সঙ্গে মানুষকে বাঁধে যে বাঁধন, তাকে ওরা মানেনি। * * * পূজো পড়েছে ধুলোয়, ভক্তি করেছে মাটি। রথের দড়ি প'ড়ে থাকে বাইরে। সে থাকে মানুষে মানুষে বাঁধা—দেহে দেহে প্রাণে-প্রাণে। সেইখানে জমেছে অপরাধ, বাঁধন হয়েছে দুর্বল। * * * এইবেলা থেকে বাঁধনটাতে দাও মন—রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধুলোয় ফেলো না। * * * আজকের

মতো বলো সবাই মিলে, যারা এতদিন মরে ছিল তারা উঠুক বেঁচে ; যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।"

বলা বাহুল্য, এই রূপকের প্রত্যক্ষ আশ্রয় সমসাময়িক সমাজ-মানস। সমসাময়িক বাংলা ও ভারতের রাষ্ট্র ও সমাজচেতনায় যে পৃথিবীর আদর্শ ক্রমশ স্বীকৃতির পথে ধরা দিতেছিল তাহারই প্রকাশ এই নাটিকাটিতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লক্ষ্যণীয় যে কবি একান্ত-ভাবে শূদ্র-শাসিত সমাজ ব্যবস্থার পরিকল্পনাও করিতেছেন না। মহাকালের রথ অচল হইয়াছিল শূদ্র-শক্তিকে একান্তভাবে অস্বীকার করা হইয়াছিল বলিয়া; পুরোহিততন্ত্র, ধনতন্ত্রকেই একান্তভাবে সকল শক্তির উৎসরূপে স্বীকার করা হইয়াছিল বলিয়া। তাহার ফলেই হইয়াছিল তালভঙ্গ, ছন্দ পতন, ভারসাম্যের হানি। তাল মিলাইয়া, ছন্দ বাঁচাইয়া, ভারসাম্য রক্ষা করিয়া চল, একদিকে ঝোঁক বেশি দিও না, তাহা হইলেই মহাকালের রথ চলায় বিঘ্ন হইবেনা—ইহাই যেন কবির যুক্তি। একান্ত সাম্প্রতিক মানসে এ-যুক্তি স্বীকৃতি লাভ নাও করিতে পারে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ কথা অনস্বীকার্য যে 'রথের রশি'র ব্যঞ্জনা এ-যুক্তি অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, এবং এ-যুগে শূদ্রশক্তির মধ্যেই যে রথ চালনার কর্তৃত্ব নিহিত সে-ইঙ্গিত বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। তত্ত্বমূলীয় রূপক হওয়া সত্ত্বেও 'রথের রশি'তে নাটকীয় গতি অব্যাহত, এবং সমাজ-বিবর্তনের ইঙ্গিতগুলি বিভিন্ন চরিত্রের বচনবাচনে সুস্পষ্ট। আধুনিক গণ-চেতনা সমৃদ্ধ মানসে এই নাটিকাটি অধিকতর সমাদরের অপেক্ষা রাখে।

'কবির দীক্ষা' রচনাটিকে যথার্থ নাটক বলা কঠিন। কোনও ঘটনা নাই, কোনও গতি নাই, আছে শুধু দুইজনের কথাবার্তা, এবং তাহাদেরও চারিত্রিক বিবর্তন কিছুই নাই—যাহা আছে তাহা শুধু একটু তত্ত্ব, ত্যাগের কাব্যীয় দর্শন। শিবমন্ত্রের উপাসক কবি ভিক্ষার

মন্ত্রে, ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া থাকেন। কিন্তু এই ভিক্ষা, এই ত্যাগ নেতিধর্মী নয়, শূন্যতার স্তবপূজা নয়।

"ত্যাগের রূপ দেখ ঐ ঝরনায়, নিয়ত গ্রহণ করে, তাই নিয়তই করে দান। * * * দারিদ্র্যে তাঁরই মহত্ত্ব, মহৎ যিনি ঐশ্বর্যে। মহাদেব ভিক্ষা নেন পাবেন বলে নয়, আমাদের দানকে করতে চান সার্থক। * * * কিছু তিনি চাননি কুকুর-বেড়ালের কাছে। অন্ন চাই বলে ডাক দিলেন মানুষের দ্বারে। বেরোলো মানুষ লাঙল কাঁধে। যে-মাটি ফাঁকা ছিল প্রকাশ পেল তাতে অন্ন। বললেন চাই কাপড়—হাত পেতেই রইলেন। বেরোলো ফলের থেকে তুলো, তুলোর থেকে সুতো, সুতোর থেকে কাপড়। ভাগ্যে তাঁর ভিক্ষার ঝুলি অসীম তাই মানুষ সন্ধান পায় অসীম সম্পদের। নইলে দিন কাটতো কুকুর-বেড়ালের মতো। তোমরা কি বলো সবচেয়ে সন্ন্যাসী ঐ কুকুর-বেড়াল। * * * মানুষকে যদি দেউলে করেন তিনি, তবে ভিক্ষু-দেবতার ভিক্ষা হবে যে অচল। তাঁর ভিক্ষার ঝুলির টানে মানুষ হয় ধনী, যদি দান করতেন ঘটতো সর্বনাশ। * * * প্রাণের ধনই হলো আনন্দ, যাকে বলি রস। যেখানে রসের দৈন্য, ভরে না সেখানে প্রাণের কমণ্ডলু। * * * মানুষের যিনি শিব তিনি বিষ পান করেন বিষকে কাটাবেন বলে। ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও দ্বারে দ্বারে রব উঠলো তাঁর কণ্ঠে,—সে ভিক্ষা মুষ্টি ভিক্ষা নয়, নয় অবজ্ঞার ভিক্ষা। নির্ঝরিণীর স্রোত যখন হয় অলস তখন তার দানে পঙ্ক হয় প্রধান। দুর্বল আত্মার তামসিক দানে দেবতার তৃতীয় নেত্রে আগুন উঠে জ্বলে।"

বিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদে ভারতের রাষ্ট্রসাধনার ভিক্ষা ও ত্যাগের ওপর জোরটা পড়িয়াছিল বেশি, দারিদ্র্য বস্তুটাকে একটা সুমহান আদর্শ হিসাবে দাঁড় করাইবার চেষ্টাও দেখা দিয়াছিল, এমন কি এই পর্বের সমস্ত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক চিন্তাটার প্রকৃতিই ছিল নঙর্থক ও নেতিবাচক। রবীন্দ্র-কবিচিত্ত ইহাকে স্বীকার করে নাই। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্ব যে রবীন্দ্রনাথের পুরাপুরি স্বীকৃতি লাভ করে নাই, ইহাও তাহার আংশিক হেতু। রবীন্দ্রনাথের ভিক্ষা ও ত্যাগের ধর্ম অভাবাত্মক যে নয় তাহা কবির পূর্বজীবনের অনেক

রচনায়ও সুস্পষ্ট। ঐশ্বর্যে যে সমৃদ্ধ দারিদ্র্য তাহারই অলংকার; ভিক্ষা ও ত্যাগের গর্ভে থাকা চাই অসীম বিত্ত ও চিত্তসমৃদ্ধি। দারিদ্র্য আদর্শ নয়, ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধিই আদর্শ; ভিক্ষা ও ত্যাগের শুভ্র দীপ্তি ফুটিতে পারে তাহারই প্রেক্ষাপটে। 'কবির দীক্ষা' রচনাটিতে এই তত্ত্বটুকুই ব্যক্ত হইয়াছে; কবি-মানসের ইতিহাসের দিক হইতে এই তথ্যটুকু মূল্যবান।

"বাঁশরী" নাটক নগরাশ্রয়ী সামাজিক নাটক; "পরিত্রাণ" বা "তপতী", "কালের যাত্রা" বা "চণ্ডালিকা" ইহাদের কাহারও সঙ্গে এই নাটকের কোনও সম্বন্ধ নাই, না ভাবে ইঙ্গিতে না নাটকীয় ধর্মে। বরং "গৃহপ্রবেশ" "শোধবোধে"র সঙ্গে ইহার খানিকটা একগোত্রীয়তা আছে, যদিও তাহা অত্যন্ত দূরবর্তী। ভাষায় ও বচনভঙ্গিতে "বাঁশরী" "দুই বোন-মালঞ্চ-চার অধ্যায়" উপন্যাসের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা; এমন কি, এই হিসাবে "শেষের কবিতা"র ব্যঙ্গ ও epigram-সমৃদ্ধ বাঁকম ও ও চতুর বাক্‌ভঙ্গি ও ভাষার সঙ্গে এই গ্রন্থের একটা দূর আত্মীয়তা সহজেই লক্ষ্য করা যায়, যদিও পরবর্তী উপন্যাসগুলির মতনই "বাঁশরী"র ভাষার বা বাক্‌ভঙ্গিতে "শেষের কবিতা"র শানিত দীপ্তি, আলো ঝল্‌মল্ চমক্ অনেক দুর্বল ও স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। নাটক হিসাবেও "বাঁশরী" দুর্বল; ইহার ঘটনা-সংস্থানে অথবা চরিত্রের বিবর্তনে নাটকীয় ধর্মের উপস্থিতি স্বল্পই। সুষমা, বিশেষ ভাবে বাঁশরীর চরিত্রে, সোমশংকরের চরিত্রে দ্বন্দ্ব নাই, এ কথা বলা চলে না, কিন্তু সে দ্বন্দ্ব চিত্তগত, মনের মধ্যেই তাহার লীলা; একমাত্র বাঁশরীর চিত্তদ্বন্দ্ব নাটকীয় কর্মকৃতির মধ্যে কতকটা প্রকাশ পাইয়াছে, এবং এই গ্রন্থের যাহা কিছু নাটকীয় গুণ তাহা শেষের দিকে প্রধানত বাঁশরী-পুরন্দর, বাঁশরী-সোমশংকর এবং আংশিক ভাবে অন্য দু'একটি দৃশ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও, বারবারই এ কথা মনে হয়, "বাঁশরী"র

গল্পবস্তু বড় গল্প বা ছোট উপন্যাসের, যথার্থ নাটকের নয়, এবং সেই হিসাবে মনে হয় "বাঁশরী" "দুই বোন-মালঞ্চে"র মত আর একটি ছোট উপন্যাস হিসাবেই হয়ত অধিকতর সার্থকতা লাভ করিত।

"বাঁশরী"র চিত্তদ্বন্দ্ব একটু জটিল। যে-সোমশংকরের সঙ্গে বাঁশরীর অন্তরের গ্রন্থি সেই সোমশংকর পুরন্দর-নির্দিষ্ট ব্রতের আহ্বানে সুষমার সঙ্গে পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চলিয়াছে, অথচ সুষমা ও সোমশংকরের মধ্যে হৃদয়গত কোন ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠে নাই। এ-মিলন প্রয়োজনের মিলনে। যাহার ব্রতাদর্শের প্রেরণায় এই মিলন ঘটিতেছে, সুষমা সেই সন্ন্যাসী পুরন্দরের অনুরাগিণী; পুরন্দর তাহা জানিয়া শুনিয়াই নিজে উদ্যোগী হইয়া এই প্রয়োজনের মিলন ঘটাইতেছে। সোমশংকর ভালবাসে বাঁশরীকে; সুষমা যে তাহাকে ভালবাসে না তাহাও সে জানে, এবং তাহা জানিয়াও পুরন্দরের আহ্বানে এই প্রয়োজনের মিলনমালা গলায় পরিতে রাজী হইয়াছে; কিন্তু বিবাহ-বন্ধনের পূর্বমুহূর্তে পারস্পরিক পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের যে-দৃশ্য দর্শক ও পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইল সেখানে নায়িকা সুষমা নহে, সে-নায়িকা বাঁশরী, এবং নায়ক সোমশংকর। সোমশংকর হৃদয়ের মধ্যে পাইল বাঁশরীকে প্রেমের চিরন্তন সঙ্গিনীরূপে, আর প্রতিদিনের প্রয়োজন, পুরন্দর নির্দিষ্ট ব্রতাদর্শের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য পাইল সুষমাকে। পুরন্দরেরই প্রয়োজনের জন্য সুষমা পুরন্দরকে ছাড়িতে বাধ্য হইল। আর বাঁশরী, সে সোমশংকরকে পাইল হৃদয়ের মধ্যে প্রেমের একটি আত্মগত আদর্শের মধ্যে; পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে প্রতিদিনের প্রেমসঙ্গের কামনা অবলীলায় সে প্রত্যাখ্যান করিল।

যে-সমাজশ্রেণী এই নাটকের আশ্রয়, সেই শ্রেণীতে পুরন্দরের এই প্রতিষ্ঠা দর্শক ও পাঠকচিত্তে নিঃসংশয় বিশ্বাস বহন করে না, তাহার ব্রতাদর্শ অস্পষ্ট, এবং কিসের জোরে সুষমা ও সোমশংকরকে, বিশেষ

করিয়া সোমশংকরকে এই অনুরাগলেশবিহীন প্রয়োজন-সর্বস্ব মিলনে তিনি বাঁধিতে পারিলেন তাহার কোনও ইঙ্গিতই নাটকে নাই। তাহা ছাড়া, পুরন্দর চরিত্রের চমক এত বেশী, এত বেশি রহস্যময় যে এই ধরনের বস্তু-ঘনিষ্ঠ সামাজিক নাটকে এতটা চমক্ এতটা রহস্য বস্তু-প্রত্যয়কে শিথিল করিয়া দেয়। ক্ষিতীশ চরিত্র খুব জীবন্ত এবং বাঁশরী চরিত্রের নাটকীয় দীপ্তি অনেকখানি সম্ভব হইয়াছে ক্ষিতীশকে অবলম্বন করিয়া। কিন্তু কি গল্পে কি চরিত্রে ক্ষিতীশের কোনও স্বকীয় মহিমা নাই, তাহার নিজস্ব কোনও দীপ্তি নাই, সে স্থিতদণ্ড নয়, অথচ এই নিজস্ব দীপ্তি ও স্বকীয় মহিমায় আর আর প্রত্যেকটি চরিত্রই উজ্জ্বল—বাঁশরীত বটেই, পুরন্দর, সোমশংকর এমন কি সুষমাও।

"বাঁশরী" নাটক হিসাবে খুব উল্লেখযোগ্য হয়ত নয়, কিন্তু এই গল্পবস্তু রবীন্দ্র-মানসের একটা দিকে অতি সুস্পষ্ট আলোকপাত করে। রবীন্দ্র-মানসে নরনারীর প্রেম ও যৌনসম্বন্ধগত এক অভিনব প্রত্যয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রত্যয় গড়িয়া উঠিয়াছে একটা জীবনদর্শনকে আশ্রয় করিয়া। দেহ ও আত্মার পৃথক অস্তিত্ব, সমাজ-সম্বন্ধের অতীত, প্রয়োজন-চেতনার অতীত প্রেমের একটা ব্যাপ্ত ও নিগূঢ় আদর্শগত দিক এবং বিবাহ-বন্ধনগত ব্যবহারিক দিক, এই দুইদিকের পৃথক অস্তিত্ব এই প্রত্যয়ের অন্তর্গত। "বাঁশরী"-নাটকেও এই প্রত্যয় ধরা পড়িয়াছে; সোমশংকরের প্রেমের একতম তীর্থ বাঁশরী, সেই তাহার গূঢ়তম জীবনের একমাত্র আশ্রয়, যাহা কিছু হৃদয়-বন্ধন তাহা বাঁশরীর সঙ্গে, কিন্তু সে বিবাহ করিতেছে সুষমাকে প্রতিদিনের জীবনের ব্যবহারিক দিককে সার্থকতা দিবার জন্য। এই প্রত্যয়, এবং যে-জীবনদর্শনকে এই প্রত্যয় আশ্রয় করিয়াছে সে-সম্বন্ধে আমি এই গ্রন্থের অন্যত্র, উপন্যাস আলোচনা-প্রসঙ্গে কতকটা বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিয়াছি; এখানে ইঙ্গিতটুকু মাত্র রাখিয়া যাইতেছি।

(৯)

শেষ বর্ষণ (১৩৩৩)

বসন্ত (,,)

সুন্দর (,,)

নটীর পূজা (,,)

নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা (১৩৩৪)

নবীন (১৩৩৭)

শাপমোচন (১৩৩৮ ?)

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা (১৩৪২)

পরিশোধ (১৩৪৩)

এই পর্যায়ের সব ক'টি গ্রন্থই গীতি ও নৃত্যনাট্য ; গান ও নৃত্যই তাহাদের বাহন ; গান ও নৃত্যই এই রচনাগুলির রস-সঞ্চারের মূলে। ইহাদের মধ্যে নাটকীয় সংস্থান, নাটকীয় গতি-পরিণতির, নাটকীয় রসের সন্ধান অবান্তর। অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও গভীর ইহাদের রসসংবেদন, অত্যন্ত গূঢ় ও ব্যাপ্ত ইহাদের ব্যঞ্জনা। অনুভূতির বিশুদ্ধতায়, ভাবের গভীরতায়, উপলব্ধির সূক্ষ্ম সজীবতায় এবং আনন্দের সর্বব্যাপী অথচ সংযত উল্লাসে ইহারা অনেক ক্ষেত্রে গীতিকবিতার রসসংবেদনকেও অতিক্রম করিয়া যায়। নাটকের দিক হইতে ইহাদের বিচার ও আলোচনা করিতে গেলে ইহারা কি করিয়া যেন হাতের মুঠা এড়াইয়া উড়িয়া যায়। কোনও সাহিত্য-সংজ্ঞায় বাঁধিয়া ইহাদের পরিচয় দিবার চেষ্টা নিতান্তই বিড়ম্বনা। বস্তুত, ইহাদের মূল্য-কাব্যের ক্ষেত্রে, সুর ও নৃত্যের রসমাধুর্যের ক্ষেত্রে, লোকোত্তর জীবনরস আস্বাদনের ক্ষেত্রে। নৃত্যে, গীতে, আবৃত্তিতে ইহাদের অভিনয় এমন একটি অপূর্ব আনন্দ-লোক সৃষ্টি করে যেখানে বিশ্লেষণ-বুদ্ধি স্তব্ধ হইয়া যায়। যে-আনন্দ যে-উপলব্ধি কবির দৃষ্টি ও মনে তাহা দর্শক ও পাঠকচিত্তে সঞ্চার করিয়া

দিয়াই তাঁহার দায়িত্ব-মুক্তি ; ইহাদের সম্বন্ধে তথ্যবিচার অবান্তর, তত্ত্ব-বিচারও সংক্ষিপ্ত, ভাবকল্পনার রূপটাই প্রত্যক্ষ ও সর্বব্যাপী এবং তাহার প্রায় সবটুকুই সুরে ও সংগীতে প্রকাশমান। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি শুধু গানের মালা দিয়াই গাঁথা, যেমন "সুন্দর" ও "নবীন" ; ইহাদের যাহা কিছু নাট্যরূপ তাহা শুধু নৃত্যের মধ্য দিয়াই ব্যক্ত হইয়াছে ; ইহাদের গানের সুরের মত এই নৃত্যরূপও একান্তভাবে ভাবানুগামী। দু'একটি রচনার, যেমন "শাপমোচন", "নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা" ও "পরিশোধে"র মঞ্চ-রূপায়ন মূকাভিনয়ে ; গান ও নৃত্যকে আশ্রয় করিয়াই লেখকের ভাবকল্পনা প্রসারিত হইয়াছে। "নবীনে" তবু গদ্য ব্যাখ্যানের সাহায্যে গানগুলিকে গাঁথা হইয়াছে ; "সুন্দর", "শাপমোচন" "নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা" কিংবা "পরিশোধে" তাহাও নাই। "নটরাজ"ও কতকটা শেষোক্ত পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত, যদিও "নটরাজে" গান ও নৃত্যের সঙ্গে সমান তাল রাখিয়া চলিয়াছে কবিতা আবৃত্তি। চরিত্রাশ্রয়ী আলাপনের সাহায্য মাত্র না লইয়া শুধু নৃত্যে ও সংগীতে ভাবকল্পনাকে বিস্তৃত করা এবং লেখকের আনন্দোপলব্ধি দর্শকের চিত্তে সঞ্চারিত করার এই অপূর্ব নাটকীয় কৌশল আধুনিক সাহিত্যে ও অভিনয়-কলায় বহুদিন অনভ্যস্ত ও অনাবিষ্কৃত ছিল। অথচ, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্য, এমনকি বাংলাদেশের এক জাতীয় লোকা-ভিনয়ে এই কৌশল একান্ত অপরিচিত ছিল না। শুধু নৃত্য ও সংগীত আশ্রয় করিয়া ভাবকল্পনার বিস্তার এবং দর্শকচিত্তে কাব্য ও নাটকীয় রসের সঞ্চার, ইহাই ভারতীয় ঐতিহ্যে নাট্যের আদিমতম রূপ, এবং এই রূপ সমাজের নিম্নতম স্তরে নিরক্ষর জনসাধারণের শিল্পমানসকেও অধিকার করিয়াছিল। কোনও কথার আশ্রয় না লইয়া শুধু নাচিয়া ও গান গাহিয়া নিজেদের ভাব ও কল্পনাকে ব্যক্ত করা এবং সেই সূত্রে দর্শকের চিত্তে একটা বিশিষ্ট নির্দিষ্ট রসোপলব্ধি সঞ্চার করা, ইহাই যেন

ছিল আমাদের বৃহত্তর গণসমাজের সহজতম নাটকীয় প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের কল্প-মানসে এই রূপই আরও সূক্ষ্ম, আরও সমৃদ্ধ হইয়া এই বিশিষ্ট নৃত্যনাট্যলোকের সৃষ্টি করিয়াছে। বস্তুত, এই ধরনের নাট্য-রচনায়, কি গানে কি আলাপনে, কথার মূল্য খুব বেশি নয়, কথাকে বহুদূর অতিক্রম করিয়া যায় গানের সুর এবং নৃত্যের ছন্দ ও ভঙ্গি। "নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা"র বিজ্ঞপ্তিতে কবি তাই বলিতেছেন, "এ কথা মনে রাখা কর্তব্য যে, এই জাতীয় রচনায় সুর ভাষাকে বহুদূর অতিক্রম করে থাকে; এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে। কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য নয়। যে-প্রাণীর প্রধান বাহন পাখা, মাটির উপরে চলার সময়ে তার অপটুতা অনেক সময় হাস্যকর বোধ হয়!"

"শেষবর্ষণ" প্রথম অভিনীত হয় কলিকাতায় ১৩৩২'র ভাদ্রে, "বসন্ত" কলিকাতায় ম্যাডান রঙ্গমঞ্চে ১৩২৯'র ফাল্গুনে এবং "সুন্দর" শান্তিনিকেতনে ১৩৩১'র ফাল্গুনে। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে "ঋতু উৎসব" নামে যে-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাহাতে পুরাতন "শারদোৎসব" ও "ফাল্গুনী"র সঙ্গে সঙ্গে এই তিনটি নাট্য-রচনাও ঋতু-ক্রমানুযায়ী সন্নিবিষ্ট হয়। বর্ষার শেষ হইতে বসন্তের শেষ পর্যন্ত যে-ঋতুরূপ স্পর্শকোমল কবিচিত্তে ক্ষণে ক্ষণে ভাবের ও কল্পনার ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছিল তাহাকে কখনও গানে, কখনও নাটকীয় কথায় ভঙ্গিমায় রূপান্তরিত করিবার প্রয়াস এই রচনা-গুলিতে। শান্তিনিকেতনের আশ্রম-বিদ্যালয় ও তাহার জীবনচর্যার আদর্শ ও আবেষ্টন এই রচনাগুলির পশ্চাদপটে; বস্তুত এই পর্যায়ের প্রায় সব রচনাই, বিশেষভাবে ঋতু-উৎসবাশ্রয়ী রচনাগুলি আশ্রম-বাসীদের উপভোগ ও উপলব্ধির জন্যই রচিত। জীবনচর্যার যে সূক্ষ্ম ও সৌন্দর্যময় কল্পাদর্শ কবির মনে তাহাই তিনি সঞ্চার করিতে চাহিয়াছিলেন

তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবনচর্যায়। এই রচনাগুলির স্বাভাবিক পরিবেশও আশ্রমিক আদর্শ ও আবেষ্টনের পরিবেশ। এই আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়াই বিভিন্ন ঋতুর বিচিত্ররূপ তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল ; এই ফুল, এই পাখি, এই বৃষ্টি, এই খর রৌদ্র, এই শালবন, আমলকীর ডাল, উদার মাঠ সব কিছুকে লইয়া মাটির পৃথিবীর প্রতি তাঁহার যে সুগভীর প্রীতি ও ভালবাসা শেষ জীবনে গভীর হইতে গভীরতর হইতেছিল তাহা বিশেষভাবে এই আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়াই। সেই ভালবাসার আনন্দ, কল্পাদর্শের মধুর উজ্জীবন রস তিনি সঞ্চারিত করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহার আশ্রমের মানসপুত্রকন্যাদের মধ্যে। তাহাদের উপলক্ষ করিয়া তাঁহার অগণিত দেশবাসীও সেই আনন্দের অংশীদার হইয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও একথা সত্য যে ইহাদের অভিনয়োৎসব শান্তিনিকেতন আশ্রম-পরিবেশে যত সত্য ও সার্থক, অন্যত্র ততটা কিছুতেই নয়।

১৩৩৩ বঙ্গাব্দে "বিচিত্রা" মাসিক পত্রিকায় "নটরাজ" এবং ১৩৩৪'র "মাসিক বসুমতী"তে "ঋতুরঙ্গ" নাম দিয়া দুইটি রচনা প্রকাশিত হয়। এই রচনা দুইটি কবিতা ও গানের সমষ্টি। পরে এইগুলিই একত্র করিয়া সাজাইয়া "নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা" নামে নৃত্য, গীত ও আবৃত্তি সম্বলিত অভিনয়োপযোগী একটি অখণ্ড রচনা "বনবাণী" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে। "শেষবর্ষণ", "বসন্ত", "সুন্দর" বা "নবীন" যেমন অন্তিম বর্ষা ও বসন্ত এই দুইটি ঋতুর সৌন্দর্য-বন্দনা, "নটরাজ ঋতু রঙ্গশালা"ও তেমনই ষড়ঋতুর লোকোত্তর সৌন্দর্য-বন্দনা। ভাবের সূক্ষ্ম শুচিতায়, সৌন্দর্যময় নিসর্গ-বর্ণনায়, অনুভূতির গভীরতায়, অনবদ্য চিত্রমহিমায়, নিবিড় ঐতিহ্য গরিমায়, সর্বোপরি ভিন্ন ভিন্ন বিচিত্র পৃথক রূপকে একটি অখণ্ড রূপ ও রস-সমগ্রতায় "নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা" এবং ঋতু উৎসবাশ্রয়ী

অন্যান্য রচনা আমাদের দেশের বিভিন্ন ঋতুগত কবিকল্পনাকে যে প্রায় স্পর্শসহ প্রায় দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ দিয়াছে, বিভিন্ন ঋতুগুলির মধ্যে যে নূতন অর্থ ও ব্যঞ্জনার, নূতনতর অনুভূতি ও উপলব্ধির আনন্দবেদনায় অভিজ্ঞতার সন্ধান দিয়াছে তাহার তুলনা আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্য-ঐতিহ্যে আর কোথাও দেখা যায় না। গানের পর গান গাঁথিয়া এবং তাহার সঙ্গে নৃত্য ও আবৃত্তি জুড়িয়া দিয়া কোনও কথা বা কাহিনীর আশ্রয় না লইয়া শুধু সুর ও নৃত্যের অবলম্বনে একটা সমগ্র নাটকীয় রূপ দাঁড় করান যায়, একটা অখণ্ড নাটকীয় রস-সমগ্রতা গড়িয়া তোলা যায়, এই সাহিত্য রচনাগুলির অভিনয় না দেখা পর্যন্ত তাহা বিশ্বাস করাই যায় না। গান ও কবিতাকে যে একটা দৃশ্যগত রূপ দেওয়া যায়, শুধু খণ্ড গান ও খণ্ড নৃত্যের খণ্ড খণ্ড ভাবমূর্তিতে নয়, একটা পরিপূর্ণ সমগ্র মূর্তি দেওয়া যায়, সব গান, সব নৃত্য, সব আবৃত্তিকে পর পর গাঁথিয়া একটা অভিনয়গ্রাহ্য দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ দেওয়া যায়, ইহা যে কত বড় কবিকর্ম, কত বড় নাটকীয় কৌশল তাহা অনেক সময় উপলব্ধি করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথ প্রযোচিত "নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা"র অভিনয়োৎসব যাঁহারা দেখিয়াছেন আশা করি তাঁহারা সকলেই একথা স্বীকার করিবেন। এই দিক দিয়াই ইহার নাটকীয় সার্থকতা। বিচ্ছিন্নভাবে এই গান বা আবৃত্তিগুলি শুনিলে, নাচগুলি দেখিলে ইহার নাটকীয় সমগ্র রূপটি ধরা পড়ে না, যদিও খণ্ড খণ্ডভাবে প্রত্যেকটিরই পৃথক মূল্য অনস্বীকার্য; সে-মূল্য প্রধানত তাহাদের কাব্যমূল্য অথবা সুর তাল ও ছন্দের মূল্য।

যত লোকোত্তর জীবনরসের আস্বাদনের ক্ষেত্রই হউক না কেন এই রচনাগুলি—আমি বিশেষভাবে ঋতু-উৎসবাশ্রয়ী রচনাগুলির কথাই বলিতেছি—ইহাদের কল্পমানসের বক্তব্য কিছু আছে। "শেষবর্ষণ" ও "বসন্ত" ত সোজাসুজি "শারদোৎসব-ফাল্গুনী"র আদর্শেই রচনা; তবে

ইহাদের গল্পবস্তু আরও সহজ ও সংক্ষিপ্ত। এখানেও রাজা ও কবির উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। রাজা ও রাজসভা ঘোরতর বিষয়ী, উৎসবের আনন্দের মধ্যেও তাঁহাদের বিষয়াসক্তি আনন্দকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করিতে দেয় না, তাঁহাদের বিষয়-কামনা প্রকৃতির সঙ্গে মানবচিত্তের নিগূঢ় মিলনের পথে বাধার প্রাচীর তুলিয়া দেয়। কবি হইতেছেন অনাবিল সৌন্দর্যের পূজারী, বিষয়ের প্রতি আসক্তি তাঁহার নাই। এই কবি যখন প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় মিলনের আনন্দে আত্মলীন হইয়া যান, তখন সেই আনন্দের স্পর্শ লাগে রাজারও চিত্তে; রাজা তখন বিষয়কর্ম্ম ভুলিয়া কবির সঙ্গে সেই আনন্দ-নৃত্যে মাতিয়া উঠেন, রাজসভার অর্থসচিব তিনিও অর্থের চিন্তা ভুলিয়া গিয়া সেই নৃত্যে যোগদান করেন। তখন উৎসব হয় পূর্ণ ও সার্থক। ঋতু উৎসবের ইহাই অন্তরের কথা; নিসর্গের সঙ্গে মানব চিত্তের নিগূঢ় পরিপূর্ণ মিলনেই বিশ্বের আনন্দোৎসব পূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ করে। "নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা"র ভিতরের কথাটি আরও গভীর।

"নটরাজের তাণ্ডবে তাঁর এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হয়ে প্রকাশ পায়, তাঁর অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশের রসলোক উন্মথিত হতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। নটরাজ পালাগানের এই মর্ম।"

নটরাজ কাল-দেবতা। নটরাজের নৃত্য জীবন-নৃত্য। মহাকালের তাণ্ডবনৃত্য চলিতেছে অবিরাম, তাঁহার নৃত্যের ছন্দেই বিশ্ব আবর্তিত হইতেছে; ঋতুচক্র আসিতেছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া। তাঁহারই নৃত্যের বিচিত্র আবেগের রঙ্গে বিভিন্ন ঋতুর বিচিত্র রং ও আবেগ। তাঁহাকে ঘিরিয়া সমগ্র ভারতীয় কল্প-মানসের সুগভীর ঐতিহ্য আবর্তিত। "নটরাজ ঋতুরঙ্গশালার"র পালাগানের ভিতর দিয়া মহাকালের এই

এই গভীর নৃত্যলীলা, বিভিন্ন ঋতুর বিচিত্র রং ও আবেগ, ঐতিহ্যের গভীরতম ব্যঞ্জনা কবি আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর করিয়াছেন ; আমাদের আহ্বান করিয়াছেন সেই নৃত্যচ্ছন্দকে আত্মসাৎ করিয়া চিত্তকে বন্ধন-মুক্ত করিতে, আমাদের মধ্যে বিদ্রোহী যত অণু-পরমাণু আছে নৃত্যের ছন্দ-বশ্যতার মধ্যে আনিয়া তাহাদের সৌন্দর্যের মধ্যে এক অখণ্ড সামঞ্জস্য দান করিতে। ঐতিহ্য ও আধুনিক বিজ্ঞান, বহির্লোকের বিচিত্র রূপ ও অন্তর্লোকের সুগভীর উপলব্ধির রসে ব্যঞ্জনায় এমন অপূর্ব কাব্য ও নাট্য রূপায়ন সাহিত্যে সুদুর্লভ।

"নটীর পূজা—শাপমোচন—নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা—পরিশোধ" এই সব ক'টি রচনাই কোনও না কোনও কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া লঠিয়াছে। অর্থগরিমায়, ভাবব্যঞ্জনায়, সার্থক ঐতিহ্য ইঙ্গিতে নাটকীয় সংস্থানে এবং অভিনয়োপযোগিতায় ইহাদের মধ্যে "নটীর পূজা" সর্ব শ্রেষ্ঠ। বস্তুত, "নটীর পূজা" পরিণত বয়সের সকল নাট্য-রচনার মধ্যে সগৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রতীকী নাট্য ইহাকে কিছুতেই বলা চলে না, কিন্তু নিছক লোকোত্তর রসের দৃশ্যকাব্য হিসাবে ইহা "ডাকঘর—অরূপরতনের"র সঙ্গে নিঃসন্দেহে একাসন দাবি করিতে পারে !" শাপমোচন—নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা—পরিশোধ" কাহিনী আশ্রিত হওয়া সত্ত্বেও তিনটিই শুধু নৃত্য ও গীতের সাহায্যে মূকাভিনয়ের জন্য রচিত। "শাপমোচন" গদ্যছন্দে একটি কথিকা, "পুনশ্চ"-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। ১৩৩৮-৩৯ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতন আশ্রমে কথাকলি নৃত্যের প্রবর্তন হয়। এযাবৎ যে-ধরনের নৃত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল সেগুলি খণ্ড নৃত্য, এ সব নৃত্যে একটি অখণ্ড সমগ্র নৃত্যরূপ গড়িয়া উঠিবার কোনও অবকাশ নাই। কথাকলি নৃত্যের লক্ষ্যই হইতেছে একটি ভাবকে নৃত্যের সাহায্যে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমগ্ররূপে ফুটাইয়া তোলা ; কিন্তু কথাকলি নৃত্য বৈয়াকরণিক রীতি-নিয়মের

শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। রবীন্দ্রনাথের চেষ্টা হইল ইহাকে সেই ব্যাকরণ-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটি অখণ্ড সমগ্র ভাববস্তুর বাহন করিয়া তোলা। কথার সাহায্য যেটুকু তাহা শুধু গানের মধ্য দিয়া। "শাপমোচন" এই চেষ্টার প্রথম ফল। যে বৌদ্ধ আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া "রাজা" নাটক, তাহারই কাব্যরূপ 'শাপমোচন' কবিতা, এবং তাহারই আভাস লইয়া ইহার দৃশ্যরূপ। ইহার গানগুলি প্রায়ই পূর্বরচিত গীতিনাট্য হইতে সংকলিত; নৃত্য-রূপটাই ইহার অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য। "নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা"ও "চিত্রা-ঙ্গদা"-কাব্যের গান ও নৃত্যরূপ; এই কাব্যের সুর ও সুষ্ঠু গীতোচ্ছ্বাস একান্তভাবে গান ও নৃত্যেরই উপযোগী। এই গান ও নৃত্যের ভিতর দিয়াই "চিত্রাঙ্গদার"র ভাববস্তু দৃষ্টি-গ্রাহ্য রসরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই ভাববস্তুর আলোচনা অন্যত্র করিয়াছি, এখানে আর পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। শুধু নিজের রূপের উপর নয়, নিজের দেহের উপর ঈর্ষান্বিত হওয়া, নিজের রূপ ও দেহকে আশ্রয় করিয়া অন্যকে পাইতে হইল, ইহার জন্য দেহ ও সৌন্দর্যের উপর একটা হিংসা, ইহা যে গান ও সৌন্দর্যময় নৃত্যভঙ্গির ভিতর দিয়া কি সুন্দর অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, ইহার অভিনয় যাঁহারা দেখেন নাই তাঁহাদের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। "পরিশোধ"ও ঐ-নামীয় পুরাতন একটি কথা-কবিতার ("কথা ও কাহিনী") নৃত্যনাট্য রূপ, তবে "পরিশোধ" "শাপমোচন" বা "নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা"র মতন সার্থক অভিনয়-রূপ লাভ করিতে পারে নাই। ইহার ভাববস্তুর মধ্যেও নাটকীয় দ্বন্দ্ব-বিবর্তনের সুযোগ কম।

আগেই বলিয়াছি, কি ভাব-ব্যঞ্জনায়, কি গল্পসমৃদ্ধিতে, কি নাটকীয় বস্তু-মহিমায় ও বিন্যাসে, কি অভিনয়-গরিমায়, "নটীর পূজা" এই পর্যায়ের রচনাগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহার অভিনয়ে শ্রীমতীর ভূমিকায় নন্দলাল-দুহিতা গৌরী যে-নৃত্য রচনা করিয়াছিলেন তাহা সাহিত্য-

আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়; তবু এ-প্রসঙ্গে সেই অপার্থিব লোকোত্তর রসের অপূর্ব রূপাভিব্যক্তির কথা অনুল্লিখিত থাকিলে "নটীর পূজা"র অভিনয়-গরিমার ইঙ্গিত সম্পূর্ণ হইবে না। সত্যই গৌরী সেদিন তাঁহার নৃত্যের মধ্য দিয়া দিব্য যজ্ঞাগ্নি স্পর্শ করিয়াছিলেন। এমন অপরূপ নৃত্য আধুনিক কালে ত কোথাও দেখি নাই। গানের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতীর নৃত্যভাবাভিব্যক্তি অতুলনীয়; সংযত ভক্তির শুভ্র শুচিতার এমন নিখুঁত সৌন্দর্যময় অভিনয় যে হইতে পারে তাহা না দেখিলে বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়াই মনে হয় না। বিশুদ্ধ অভিনয়োপযোগী দৃশ্যকাব্য বা নাটক হিসাবেও "নটীর পূজা" অকপট প্রশংসার দাবি রাখে। সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত গল্পের বিবর্তনের মধ্যে একটা নাটকীয় গতি সুস্পষ্ট, এবং আরও সুস্পষ্ট ঘটনা ও চরিত্রগত দ্বন্দ্বলীলা। যে-যুগের ও যে-ধর্মের আদি রূপের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের বিকাশ তাহার ঐতিহাসিক রূপ ও আবেষ্টন এমন পরিপূর্ণ সার্থকতায়, এমন রস সমগ্রতায় গড়িয়া তোলাও অপরূপ কবিকর্ম; ভাবকল্পনার এমন বস্তুময়তা এই ধরনের সূক্ষ্ম লোকোত্তর জীবনরসের নাটকে সত্যই সুদুর্লভ। ইতিহাসের তথ্য কবিকল্পনার স্পর্শে ও ভাবানুভূতির ব্যঞ্জনায় কত গভীর, সত্য ও সার্থক রূপ লাভ করিতে পারে, নাটকীয় দ্বন্দ্বের বিবর্তনের ভিতর দিয়া অতি সূক্ষ্ম ভাবানুভূতিও কত স্পর্শগ্রাহ্য বুদ্ধিগ্রাহ্য অভিনয়-রূপ লাভ করিতে পারে, "নটীর পূজা" তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রানী লোকেশ্বরীর অন্তর্নিহিত গভীর চিত্তদ্বন্দ্ব, অঙ্কের পর অঙ্কে আবর্তিত হইয়া চতুর্থ অথবা শেষ অঙ্কে যে মহান পরিণতির মধ্যে মুক্তি পাইল, সেই রানী লোকেশ্বরী তাঁহার সমস্ত দ্বন্দ্ববিক্ষোভ লইয়া এই নাটকের নাটকীয় দীপ্তির মানদণ্ডরূপে বিরাজমান। এই মানদণ্ডের একদিকে শুচিশুভ্র স্থিরচিত্ত অবিচল শ্রীমতী ও তাহাকে ঘিরিয়া মালতী ও ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণা; অন্যদিকে

নিষ্ঠুর, গর্বদৃপ্তা রাজমহিষী রত্নাবলী ও তাহার রক্ষিণীদল। দৃশ্যপটের পশ্চাতে সম্রাট অজাতশত্রু এবং সশিষ্যদল দেবদত্তও সক্রিয়; সেখানেও দুই চিত্তধারার দ্বন্দ্ব। অজাতশত্রু দ্বিধাচারী, সন্দেহদোলায় দুল্যমান; দেবদত্তও সমান মিথ্যাচারী, কিন্তু মিথ্যাকে সে বিশ্বাস করে, তাহাকেই সত্য বলিয়া জানে, এবং সেই জানা ও বিশ্বাসে সে দৃঢ় ও নিষ্ঠুর। অজাতশত্রুর এই দ্বিধাচার এবং দেবদত্তের দৃঢ়তা মঞ্চের আড়ালে থাকিয়াও নাটকীয় দ্বন্দ্বসংঘাতের উপর উজ্জ্বল আলো ফেলিয়াছে। শ্রীমতী এই নাটকের সর্বাপেক্ষা স্বচ্ছ ও মধুর চরিত্র, এবং সে-ই পাঠক ও দর্শকের মনকে অনুক্ষণ টানিয়া রাখে নিজের চরিত্র মহিমায়, তাহার আবেষ্টনের সৌরভে, কিন্তু নিঃসন্দেহে এই নাটকের যাহা কিছু নাটকীয় দীপ্তি তাহা রানী লোকেশ্বরীর, চারিত্রিক কল্পনা ও বিবর্তনের যাহা কিছু গৌরব তাহাও রানী লোকেশ্বরীর। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার দীপ্তি অক্ষুণ্ণ। শ্রীমতীর দীপ্তি ব্যক্তিগত, তাঁহার নিজস্ব জীবনাদর্শগত; লোকেশ্বরীর দীপ্তি শিল্পগত, কবিকর্মগত। নাটকটির কারুনৈপুণ্যও অদ্ভুত। ইহাতে পুরুষের ভূমিকা একটিও নাই, অথচ নাই যে তাহা নাটকটি পাঠের অথবা অভিনয়ের সময় একবারও মনে পড়ে না; বিম্বিসার, অজাতশত্রু, দেবদত্ত ইহারা যেন ছায়ার মতন নাটকীয় গল্পবস্তুর পশ্চাতে সঞ্চরমান। নাটকটিতে চারিটি অঙ্ক, আর ছোট্ট একটি সূচনা। সমস্ত ঘটনাবস্তু একটি দিনের মধ্যে সংহত—সেদিন বৈশাখী-পূর্ণিমা, ভগবান বুদ্ধের জন্মোৎসব। অতি প্রত্যূষে রাজ-প্রাসাদের অন্তঃপুর-দুয়ারে ভিক্ষু উপলির ভিক্ষা-প্রার্থনায় দিনের সূচনা এবং শ্রীমতী চরিত্রের উন্মেষ, আর সেইদিনই সন্ধ্যায় রাজপ্রাসাদেরই অশোক তরুমূলে ভগ্ন ধর্মচৈত্য ও ভগ্নপ্রায় আসনবেদীর সম্মুখে শ্রীমতীর তনুত্যাগ। এই একটি দিনের দুই প্রান্তের সীমার মধ্যে একটি যুগের গভীর অর্থ ও ব্যঞ্জনাময় সংস্কৃতি ও ইতিহাস তাহার সব কয়টি প্রধান

নায়ক-নায়িকাকে টানিয়া আনিয়া, মাত্র কয়েকটি দৃশ্যের ঘটনাবর্তের মধ্য দিয়া এমন গভীর সংহত সমগ্রতায় তুলিয়া ধরা, এ যে কত বড় নাটকীয় কর্ম তাহা সহসা অনুভব করা যায় না।

"নটীর পূজা" নৃত্যপ্রধান নাটক নয়, ভাবপ্রধানও নয়, বস্তুপ্রধান। তবু, শ্রীমতীর নৃত্যরূপ এই নাটকটির একটি বিশেষ গরিমা, এবং এই নৃত্যরূপ "নটীর পূজা"কে সমসাময়িক কালে একটা বিশেষ মূল্য দিয়াছে। বস্তুত, এই পর্বের গীতি ও নৃত্যনাট্যগুলিতে সূক্ষ্মভাবানুভূতির অভিনয়গ্রাহ্য, দৃশ্যগ্রাহ্য রূপ হিসাবে নৃত্যরূপ একটা বিশেষ মূল্য দাবি করে; এবং তাহার বিবর্তনের ইতিহাসেরও একটা ইঙ্গিতময় বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের প্রথম চেষ্টা ছিল গান ও আলাপনের আশ্রয়ে নাটকীয় ভাববস্তু পাঠক ও দর্শকের চিত্তে সঞ্চারিত করা; সে-চেষ্টা "শারদোৎসব-ফাল্গুনী-রাজা-অরূপরতন" প্রভৃতি প্রতীকীনাট্যে তিনি বহু আগেই করিয়াছিলেন। এ-পর্বের "শেষবর্ষণ" ও "বসন্ত" এই ধারাই অনুসরণ করিয়াছে; তবে আলাপনের চেয়ে গান প্রাধান্য পাইয়াছে বেশি। ধীরে ধীরে ভাববস্তুর সঞ্চার-কৌশল আশ্রয় করিতেছে গানকে; আলাপন-নির্ভরতা ক্রমশ যাইতেছে পশ্চাতে সরিয়া। ভাবকল্পনার মূর্তি যেন ক্রমশ বিশুদ্ধতর হইতেছে। পরবর্তী স্তরে আলাপন একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে, যেমন "সুন্দর" ও "নবীনে"; অবশ্য "নবীনে" গানগুলির ভাবসংযোগ ব্যাখ্যা করিবার জন্য কিছু গদ্য আবৃত্তি আছে। নৃত্যও আছে গানগুলির সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু তাহা খণ্ডনৃত্য, ভাবমূর্তির সমগ্রতা তাহাতে নাই; গানই প্রধান আশ্রয়, নৃত্য আনুষঙ্গিক মাত্র। শেষতম স্তরে কিন্তু ভাবমূর্তির সমগ্রতার এক অপরূপ রূপ এবং তাহার বিকাশ গানের মধ্যে ততটা নয় যতটা নৃত্যের মধ্যে, এমন কি নৃত্যই তাহার প্রধান বাহন। "শাপমোচন-নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা-পরিশোধ"

এই পর্যায়ের। এই রচনাগুলিতে ভাবমূর্তির বিশুদ্ধতম অভিনয়-গ্রাহ্য রূপ—খণ্ড মূর্তি নয়, সমগ্র মূর্তি। সূক্ষ্মতম বিশুদ্ধতম ভাবকল্পনার রূপকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করিতে হইলে যে নৃত্যরূপের আশ্রয়ই অপরিহার্য আশ্রয় একথা যেন অস্বীকার করিবার উপায় নাই। "নৃত্য-নাট্য চিত্রাঙ্গদা" তাহার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। "নটীর পূজা" উপলক্ষেও এই উক্তি প্রয়োজ্য, কারণ এই নাটকের ভাববস্তুর সূক্ষ্মতম বিশুদ্ধতম অনুভূতিটিও শ্রীমতীর নৃত্যের ভিতর দিয়াই দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ লাভ করিয়াছে। শ্রীমতীর নৃত্যই ত নাটকটির সমস্ত কথা ও ভাববস্তুকে একটি রসসমগ্রতা দান করিয়াছে। নাটক বা দৃশ্যকাব্যের যাহা আদিমতম রূপ তাহা যে এত সূক্ষ্ম, এত বিশুদ্ধ, এত গভীর রসপরিণতি লাভ করিতে পারে তাহা কি রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেখাইয়া না দিলে আমরা দেখিতে পাইতাম!

ছোট গল্প

(১)

সত্য করিয়া বলিতে গেলে বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম ছোট গল্পের সৃষ্টিই করিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার আগে আমাদের সাহিত্যে ছোট গল্প বলিয়া কিছু ছিল না, পরেও যে অসংখ্য ছোট গল্প রচিত হইয়াছে তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলির সঙ্গে সমান পর্যায়ে স্থান দেওয়া যাইতে পারে, এমন গল্পের সংখ্যা খুব বেশি নয়। অথচ বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের সংখ্যাদৈন্য কিছু আছে, এখন আর এমন কথা বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের সৃষ্টি যে কেন হয় নাই, একথা ভাবিলে একটু বিস্মিত না হইয়া উপায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বতোমুখী প্রতিভা কখনও ছোট গল্প রচনার দিকে আকৃষ্ট হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। পরিসরে অথবা আয়তনে ছোট, এমন দু'একটি গল্প তাঁহার আছে, কিন্তু ছোট গল্প বলিতে কথা-সাহিত্যের যে বিশেষ প্রকাশটিকে বুঝি, বঙ্কিমচন্দ্রের এই গল্পগুলিকে সে পর্যায়ে ফেলিতে পারি না। স্বল্প পরিসরের মধ্যে জীবনের একটি ক্ষুদ্র তুচ্ছ খণ্ডাংশকে, কোনও একটি বিশেষ অভিব্যক্তিকে বা বাস্তবানুভূতিকে, দু'একটি ঘটনার আবর্তে, ভাব ও কল্পনার দ্বন্দ্বে আন্দোলিত করিয়া তাহাকে স্বাভাবিক পরিণতি দান করা, বস্তুর কোনও একটি বিশেষ পরিচয়কে রূপান্বিত করিয়া তোলা, ছোট গল্পের এই যে সুকঠিন কলা-কৃতি, রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে ইহার প্রকাশ নাই বলিলেই চলে। অথচ আমাদের বাংলা দেশে কিছুদিন আগে পর্যন্তও শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের পারিবারিক জীবনযাত্রার যে ধারা ছিল, তাহার মধ্যে বিশেষ

করিয়া ছোট গল্পের উপাদানই ছিল বেশি। উপন্যাসের সুবৃহৎ জগতে তাহার প্রবেশাধিকার বড় ছিল না; জীবনের যে বৈচিত্র্য, ঘটনার যে তরঙ্গপর্যায়, যে চঞ্চল রসসমৃদ্ধ জীবনলীলা উপন্যাসের প্রাণ, সমস্যার যে বিচিত্র জটিলতা উপন্যাসের ঘটনাস্রোতকে আবর্তে চঞ্চল ও ঘনীভূত করিয়া তোলে, আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তাহার প্রসার খুব বেশি ছিল না। যাহা ছিল, তাহার দিকেও বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি ও হৃদয় বেশি আকৃষ্ট হয় নাই, তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টিতে সে পরিচয়ও খুব বেশি নাই। সেই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসের উপাদান খুঁজিয়াছেন আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বাহিরে; আমাদের জীবনের মন্দগতি ও ধীরপ্রবাহ তাঁহার চিত্তে উপন্যাসের রোম্যান্স সঞ্চার করিতে পারে নাই। কি পল্লীতে কি নগরে আমাদের জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সরল ও সহজ, যদিও আজ তাহা নানান কারণে জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে। পারিবারিক আক্রোশ, সামাজিক দলাদলি যথেষ্টই ছিল; উইল চুরি লইয়া, অন্যান্য দুই চারি রকমের জটিলতর সামাজিক অথবা পারিবারিক ব্যাপার লইয়া হয় ত দ্বন্দ্ব আন্দোলন ইত্যাদিও হইত; এসব উপাদান লইয়া রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে গল্প-উপন্যাস কম রচিত হয় নাই। কিন্তু তাহার রকম ও বৈচিত্র্য খুব বেশি নাই, কিম্বা খুব উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টিও তাহা লইয়া হয় নাই; দুই চারিটি মাত্র উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত আছে, যেমন, "বিষবৃক্ষ", "কৃষ্ণকান্তের উইল", "স্বর্ণলতা"। কিন্তু আমাদের জীবনের বাহিরের এই সহজ ও সুলভগোচর দিকটা ছাড়া আর একটি গোপন নিভৃত দুর্লভগোচর দিক আছে। একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি লইয়া, একটু সহানুভূতিসম্পন্ন হৃদয় লইয়া এই নিভৃত দিকটির দিকে তাকাইলে সহজেই দেখা যায় রাষ্ট্রে, সমাজে ও পরিবারে আমাদের দৈনন্দিন জীবন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষোভে আন্দোলিত, বিচিত্র দুঃখ-বেদনায় পীড়িত, সুখ ও

আনন্দে উদ্বেলিত। প্রতিদিনের কর্ম-কোলাহলে সহজে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না, বৃহত্তর জগৎ ও জীবনের মুখরতার মধ্যে তাহার ক্ষীণ আহ্বান সহজেই বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু বৃহত্তর জগৎ বলিতে আমাদের কিছু ছিল না, তাহার মুখরতাও বাংলাদেশে বহুদিন পর্যন্ত শোনা যায় নাই। বলিয়াছি, আমাদের জীবন এক সময় অত্যন্ত সংকীর্ণ ও স্বল্পপরিসর ছিল, এখনও যে তাহা নয় এমন বলা চলে না; কিন্তু সংকীর্ণ ও স্বল্পপরিসর ছিল বলিয়াই জীবনে আমাদের কোন আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল না, কোনও দুঃখ এবং বেদনা-বোধ, সুখ এবং আনন্দানুভূতি ছিল না এমন নয়। মানুষের মন ও হৃদয়ের যত কিছু বিচিত্র ভাব ও অনুভূতি তাহা আমাদের অন্তরের মধ্যে নানারূপে ও রসে চিত্রিত, বর্ণে ও গন্ধে নন্দিত হইত; কিন্তু তাহা প্রকাশের কোন পথ ছিল না। তাই তাহার স্বরূপ কাহারও জানা ছিল না, জীবনের এই দুর্লভগোচর দিকটাকে জানিবার আগ্রহও ছিল না। জীবনের এই সব ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘটনা ও খণ্ডাংশ এবং তাহার তুচ্ছতর সুখ দুঃখ লইয়া সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াস রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে বড় একটা দেখা যায় না। অথচ ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ বলিয়াই, পরিসর ইহাদের কম বলিয়াই ইহাদের মধ্যে ছোট গল্পের উপাদানও বেশি করিয়াই ছিল।

রবীন্দ্রনাথই বাংলা-সাহিত্যে সর্বপ্রথম আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সংকীর্ণ ও অকিঞ্চিৎকর বহির্বিকাশের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া জীবনের তলদেশে যে নিভৃত ফল্গুধারাটি তাহা আমাদের দেখাইয়া দিলেন। দেখিলাম, সেখানে ঘরের কোণে, নদীর ঘাটে, সহস্র তুচ্ছ পরিচিত স্থানে ও আবেষ্টনে কত সহস্র তুচ্ছ ঘটনা খুঁটিনাটি উপলক্ষ করিয়া আমাদের জীবনে বিচিত্র আশা আকাঙ্ক্ষা অবিরত স্পন্দিত হইতেছে, অসংখ্য ক্ষুদ্র বিক্ষোভে আন্দোলিত হইতেছে। আমাদের দৈনন্দিন কার্যের মধ্যে সেখানে অপরূপ মাধুর্য

সুগভীর ভাবরসে বিধৃত হইয়া আছে। আমাদের বৈচিত্র্যবিহীন বাহিরের জীবন সেখানে বৈচিত্র্যে ভরপুর, আবেগে চঞ্চল, সেখানে তাহার কোনও দৈন্য নাই, কোনও অভাব নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিচিত্তের অপূর্ব সুগভীর সহানুভূতি ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দিয়া আমাদের জীবনের এই নিভৃত গোপন প্রবাহটি আবিষ্কার করিয়া তাহাকে আপন ভাব ও কল্পনায়, রূপে ও রসে আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দিলেন। আমরা একটি নূতন জগৎ ও জীবনের সন্ধান পাইয়া বিমুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম।

কিন্তু জীবনের এই গোপন প্রবাহটি খুঁজিয়া পাওয়ার মধ্যে কবি-গুরুর কোন সজাগ চেষ্টা ছিল একথা যেন আমরা কখনও মনে না করি। রবীন্দ্রনাথ কবি, এবং তাঁহার কবিপ্রতিভা একান্তভাবে লিরিক্ বা গীতি-কবিতার প্রতিভা। সরস সাবলীল গীতবহুল ছন্দের মধ্যে একটি অপূর্ব সুর ফুটাইয়া তোলা, একটি অনাহত ধ্বনি বাজাইয়া তোলাই গীতি-কবিতার ধর্ম; স্বল্পের মধ্যেই তাহা উচ্ছ্বসিত, যদিও তাহার অধিকাংশই অব্যক্ত, খণ্ডের মধ্যেই তাহার পূর্ণতা, যদিও তাহার রেশটুকু অশেষ। এক হিসাবে ইহাই রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছোট গল্পেরও ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের লিরিক্ প্রতিভার সমৃদ্ধির তুলনা নাই, সেই অতুলনীয় সমৃদ্ধি লইয়া তিনি যখন আমাদের জীবনের দিকে তাকাইলেন, বাংলাদেশের সহজ অনাড়ম্বর জীবন-প্রবাহ যখন তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, তখন সংকীর্ণ বৈচিত্র্যবিহীন জীবনের বহির্বিকাশ তাঁহার কবিচিত্তে রসানুভূতির সঞ্চার করিতে পারিল না; তাঁহার গীতপ্রবণ হৃদয়কে সহজেই দোলা দিল জীবনের নিভৃত গোপন প্রবাহটি যেখানে জীবনের খণ্ডাংশের মধ্যেই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যেই দুঃখ ও বেদনার, সুখ ও আনন্দের এক একটি সুর পূর্ণ ও উচ্ছ্বসিত হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে, অথচ সেখানেই তাহা শেষ হইয়া যায় নাই, অন্তরের মধ্যে তাহা গুঞ্জন করিয়া বাজিতে থাকে। এই জন্যই

রবীন্দ্রনাথের বেশির ভাগ ছোট গল্পই একান্তভাবে গীতিকবিতার ধর্ম লাভ করিয়াছে ; চিত্তের একটা বিশেষ মুড্ বা ভাব হইতেই তাঁহার বেশির ভাগ গল্পগুলি অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছে। আমার মনে হয়, এক কথায় ইহাই বলা যায় যে, যে-মনোধর্ম, মনের যে বিশেষ দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের সৃজনী-প্রতিভাকে গীতধর্মী করিয়াছে সেই মনোধর্ম, সেই দৃষ্টি-ভঙ্গীই তাঁহাকে গোড়ার দিকে তাঁহার ছোটগল্পের উৎসেরও সন্ধান দিয়াছে। গল্পগুলির আলোচনার সময় ক্রমেই একথা আরও পরিষ্কার হইবে, কিন্তু পূর্বাহ্ণেই বলিয়া রাখা ভাল যে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছোট গল্প তাঁহার গীতিকবিতারই আর একটি দিক ; একটু আল্‌গা করিয়া বলিতে গেলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে গীতিকবিতারই গদ্যরূপ।

(২)

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলির রচনা যে সময়টাতে আরম্ভ হয়, এবং জীবনের যে পর্বটিতে অধিকাংশ গল্পগুলি রচিত হয়, সেই উদ্ভব ও বিকাশের সময়টির প্রতি একটু লক্ষ্য রাখিলে, তাঁহার ছোট গল্পের উৎসটিকে, ধর্মটিকে, আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব। তাঁহার বেশীর ভাগ গল্প রচিত হইয়াছিল মোটামুটি ভাবে ১২৯৮ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩১০ সালের মধ্যে ; অবশ্য তাহার পরেও আরও কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধ গল্প ১৩১৪ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩২৫ সালের মধ্যে লেখা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অধকাংশ গল্পের মূলধর্মটি ঐ ১২৯৮—১৩১০ সালের-রচনাগুলির মধ্যেই পাওয়া যায়। এই বার বৎসরের একটি যুগ রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের স্বর্ণযুগ ; দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, সৃষ্টি যেন বান ডাকিয়া আসিল। "সোনার তরী" হইতে আরম্ভ করিয়া "চিত্রা", "চৈতালি", "কাহিনী", "কল্পনা",

"কথা", "ক্ষণিকা"র কবিজীবন একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বিশেষ করিয়া "সোনার তরী", "চিত্রা" ও "চৈতালি"র কবিতাগুলিতে সমস্ত বিশ্বজীবনের সঙ্গে কি সহজ ও আনন্দপূর্ণ তাঁহার যোগ; সকল কাজ, সকল অভিজ্ঞতার মধ্যে তাঁহার অপূর্ব বিস্ময়কর সৌন্দর্যবোধ। অতি তুচ্ছতম জিনিসটিও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতেছে না; জলে যে হাঁসগুলি ভাসিয়া বেড়াইতেছে, নদীর চরে যে লোকটি বসিয়া বসিয়া বাঁখারি চাঁচিতেছে, গ্রামের যে মেয়েটি নদীর ঘাটে বসিয়া অঙ্গের বসন ফেলিয়া দিয়া গা ঘসিতেছে, সবই তাঁহার চোখে পড়িতেছে, সব কিছুর মধ্যেই তিনি অপরিসীম প্রেম ও সৌন্দর্যের বিকাশ দেখিতে পাইতেছেন, সকল জিনিস মিলিয়া তাঁহার প্রাণে এক অপূর্ব মায়ালোক সৃজন করিতেছে। সৃষ্টির প্রতি তাঁহার একটি অপূর্ব ভালবাসা, একান্ত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এই সময়ের কবিজীবনের মধ্যে বারবার প্রকাশ পাইয়াছে। মনের যখন এই অবস্থা, জীবনের অতি তুচ্ছ খুঁটিনাটি জিনিসগুলিও যখন তাঁহার নিকট অপূর্ব বলিয়া মনে হইতেছে, নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ হইয়া যখন তিনি প্রকৃতির অতি তুচ্ছ সামান্য ব্যাপারটিকেও অত্যন্ত রহস্যময় বলিয়া মনে করিয়া আকুল আগ্রহে তাহা উপভোগ করিতেছেন, তখন, ভাবকল্পনার ঠিক এই পরম মাহেন্দ্রক্ষণটিতে তাঁহার ছোটগল্প রচনার সূত্রপাত হইল এবং দেখিতে দেখিতে সেই অবস্থার মধ্যেই তাঁহার অধিকাংশ গল্পগুলি রচিত ও প্রকাশিত হইয়া গেল।

সেই প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ একাত্মবোধ, জীবনের অতি তুচ্ছ ব্যাপার গুলিকেও পরম রমণীয় ও অপূর্ব রহস্যময় বলিয়া অনুভব করা, তাহাদের প্রতি অপূর্ব শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, আপনাকে একান্তভাবে নির্লিপ্ত করিয়া দিয়া একমনে জীবনটিকে প্রকৃতির সকল অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া উপভোগ করা—এসমস্তই তাঁহার ছোট গল্পগুলির মধ্যেও অপূর্ব রসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

শুধু তাঁহার কাব্যসৃষ্টি হইতেই নয়, কবির এই সময়কার জীবন-যাত্রার প্রতি লক্ষ্য করিলেও তাঁহার ছোটগল্প রচনার উদ্ভবের সময়টি আমরা বুঝিতে পারিব এবং তাহাতে এই গল্পগুলির বিশেষ ধর্মটি আরও সহজে আমাদের কাছে ধরা দিবে। 'পোস্টমাস্টারে'র মতন একটি সুপ্রসিদ্ধ গল্প ১২৯৮ সালে লেখা। এই সময়, বরং ইহার কিছুদিন আগে হইতেই কবি জমিদারি দেখাশুনার ভার লইয়াছেন, এবং তাঁহার দিনগুলি কাটিতেছে পূর্ব-বাংলার এক নদীর উপরে নৌকায় ভাসিয়া ভাসিয়া—সাজাদপুরে, শিলাইদহে। অপূর্ব আনন্দময়, বৈচিত্র্যে ভরপুর এই সময়কার জীবনযাত্রা। বাংলাদেশের একটি নির্জন প্রান্ত, তাহার নদীতীর, উন্মুক্ত আকাশ, বালুর চর, অবারিত মাঠ, ছায়া-সুনিবিড় গ্রাম, সহজ অনাড়ম্বর পল্লীজীবন, দুঃখে পীড়িত অভাবে ক্লিষ্ট অথচ শান্ত সহিষ্ণু গ্রামবাসী, সব কিছুকে কবির চোখের সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়াছে, আর কবি বিমুগ্ধ বিস্ময়ে পুলকে শ্রদ্ধায় ও বিশ্বাসে তাহার অপরিসীম সৌন্দর্য আকণ্ঠ পান করিতেছেন। এমনি করিয়াই ধীরে ধীরে বাংলা-দেশের পল্লীজীবনের সুখদুঃখের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইতে আরম্ভ করিল; গ্রামের পথঘাট, ছেলেমেয়ে, যুবাবৃদ্ধ সকলকে তিনি একান্ত আপনজন বলিয়া জানিলেন। "ছিন্নপত্রে" এই সময়কার প্রত্যেকটি চিঠিতে কবি নিজেই বারবার এসব কথা বলিয়াছেন। পল্লী-জীবনের এই সব নানান বেদনা ও আনন্দ যখন তাঁহার মনকে অধিকার করিয়া বসিল তখন তাঁহার ভাব ও কল্পনার মধ্যে আপনা-আপনি বিভিন্ন গল্প রূপ পাইতে আরম্ভ করিল, তুচ্ছ ক্ষুদ্র ঘটনা ও ব্যাপারকে লইয়া এই সব বিচিত্র সুখদুঃখ অন্তরের মধ্যে মুকুলিত হইতে লাগিল। মানব-জীবনের বিচিত্র ঘটনা প্রকৃতির ভাষাময় আবেষ্টনের সঙ্গে এক হইয়া গেল। ইহারই প্রেরণা পাইয়া গল্প লিখিবার ইচ্ছা ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিল; এক একদিন এক একটি ছোটখাট ঘটনার সূত্র ধরিয়া

এক একটি গল্প মনের মধ্যে জমিয়া উঠিল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জুন (বাংলা বোধ হয় ১৩০১ সাল হইবে) শিলাইদহ হইতে একটি পত্রে তিনি লিখিতেছেন—

আজকাল মনে হচ্ছে, যদি আমি আর কিছুই না করে ছোট ছোট গল্প লিখতে বসি তাহলে কতকটা মনের সুখে থাকি, এবং কৃতকার্য হতে পারলে পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। গল্প লিখবার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখব তারা আমার দিনরাত্রির অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বদ্ধঘরের সংকীর্ণতা দূর করবে এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের 'পরে বেড়িয়ে বেড়াবে। আজ সকাল বেলায় তাই গিরিবালা নাম্নী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি ছোট অভিমানী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণ করা গেছে।

এই ভাবে এই দিনটিতে 'মেঘ ও রৌদ্রে'র মতন একটি সুবিখ্যাত ছোটগল্পের সৃষ্টি হইল। এই ভাবেই, দুই বৎসর আগে (২৯ জুন, ১৮৯২) সাজাদপুরের কুঠিতে একদিন গ্রামের পোস্টমাস্টারের আগমন উপলক্ষ করিয়া 'পোস্টমাস্টার' গল্পটির সৃষ্টি হইল। 'সমাপ্তি' গল্পের মৃন্ময়ী, 'ছুটি' গল্পের ফটিক এরাও এই সময়কার সৃষ্টি।

'পোস্ট্‌মাস্টার' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের প্রথমতম গল্পগুলির অন্যতম। আমি যে বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের একশ্রেণীর গল্পগুলি একান্তভাবে গীত-ধর্মী, এই গল্পটি হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। একটি স্বজন-হারা নিঃসহায় গ্রাম-বালিকার স্নেহলোলুপ হৃদয় আসন্ন স্নেহবিচ্যুতির আশঙ্কায় কি সকরুণ অশ্রুসজল ছায়াপাত করিয়াছে এই গল্পটির উপর! রবীন্দ্রনাথের এই গীতধর্মী গল্পগুলির একটা প্রধান বিশেষত্ব এই যে কবির কল্পলোকের মানুষগুলি, তাহার ঘটনার আবেষ্টনটি, বাহিরের চতুর্দিকের জগতের সঙ্গে, প্রকৃতির ছায়া-আলো-গন্ধ-বর্ণ-ধ্বনি ও ছন্দের সঙ্গে একান্তভাবে মিশিয়া যায়, এবং বিশ্বজগতের পারিপার্শ্বিক ভাষাময়

আবেষ্টনের সঙ্গে এক হইয়া গিয়া একটি সুরের জগৎ সৃষ্টি করে, 'সকল ঘটনার একটি আকাশ সৃজন করে'। এই 'পোস্টমাস্টার' গল্পটি এবং এই রকম বহু গল্পের মধ্যে এই বিশেষত্বটি চোখে না পড়িয়াই পারে না। স্বজন হইতে দূরে, এক নিভৃত পল্লীতে দরিদ্র পোস্টমাষ্টারের জীবন প্রথম প্রথম প্রায় নির্বাসন তুল্য বলিয়াই মনে হইত। মাঝে মাঝে একা-একা ঘরে বসিয়া বসিয়া তিনি একটি 'স্নেহপুত্তলি মানবমূর্তি'র সঙ্গ কামনা করিতেন, নিজের ঘরের ছেলেমেয়ে-স্ত্রীর কথা তাহার মনে হইত। এই কামনাটুকু গল্পটিতে কি সুন্দর একটি করুণ সুরের রূপ লইয়াছে!

এই গল্পটিতেই, বিদায় যখন ঘনাইয়া আসিল, রতন পোস্টমাস্টারের সম্মুখ হইতে এক দৌড়ে পলাইয়া গেল। আর, ভূতপূর্ব পোস্টমাস্টার ধীরে ধীরে নৌকার দিকে চলিলেন।

"যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল—বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মত চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন, একটি সামান্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি, কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরবেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে—এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কি? পৃথিবীতে কে কাহার?"

কলাকৌশলের দিক হইতে এই তত্ত্বের উদয় না হইলেই ভাল হইত; তবু, যাহাই হউক, এমনই করিয়া পোস্টমাস্টার ও রতনের দুঃখ একটা উদাস সকরুণ পরিসমাপ্তি লাভ করিল, এবং সেই অব্যক্ত মর্মব্যথা যেন সমস্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়া একটি অপূর্ব সুরের জগৎ সৃষ্টি করিল। এইরকম সুরের জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে তাঁহার অনেকগুলি গল্পেই।

'একরাত্রি' গল্পটিতে সেই যে ঝড়ের রাত্রে বানের মধ্যে একটি বিচ্ছেদ-ব্যথিত প্রাণী "মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আনন্দের আস্বাদন" লাভ করিয়াছিল, যাহার সমস্ত ইহজীবনে "কেবল ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্ত রাত্রির উদয় হইয়াছিল, সেই রাত্রিটি শুধু সেই ভাঙা স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টারের কাছেই তুচ্ছজীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা" হইয়া রহিল না, তাহার জীবনের সমগ্র ট্র্যাজেডিটুকুও সেই একটি রাত্রির একটি সুরের মধ্যে অপূর্ব সার্থকতা লাভ করিল। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটিতেও ইহার পরিচয় আছে। এই গল্পগুলিতে ঘটনা অথবা চরিত্র-বাহুল্য বলিতে কিছুই নাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধু কেবল একটি সকরুণ অনুভূতির সুরের মধ্যেই গল্পের পরিসমাপ্তি হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলির মধ্যে মানুষ ও ঘটনার সঙ্গে প্রকৃতির যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের, নিবিড় ঐক্যের পরিচয় আছে সে-পরিচয় অনেক গল্পেই পাওয়া যায় কিন্তু তাহা একটি পরিপূর্ণ গীতিকবিতার রূপ ধারণ করিয়াছে 'সুভা' গল্পে মূক বালিকার সহিত মূক প্রকৃতির নিবিড় ঐক্য-সম্বন্ধের মধ্যে। নানান কাজে ও ব্যবহারের ভিতর দিয়া, অদ্ভুত সরস ও সহজ বর্ণনার সাহায্যে মানবচরিত্র বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতা অনেক লেখকের মধ্যেই দেখা যায়, কিন্তু অপূর্ব শিল্পকুশলী রবীন্দ্রনাথ যেমন করিয়া মনের বিভিন্ন বিচিত্র ভাব ও চিন্তাধারার সঙ্গে বিশ্বজগতের বিচিত্র ভাব প্রকাশের নিবিড় ভাবগত ঐক্যের সৃষ্টি করেন, এবং তাহার ফলে তাঁহার এক একটি গল্প যেমন করিয়া কল্পলোকের স্বপ্ন ও সংগীত-মাধুর্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, তেমন প্রকাশ আর কাহারও মধ্যে দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না।

'মহামায়া' গল্পটিতে আমার এই কথার খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। 'মহামায়া' তাহার দীপ্ত চরিত্র লইয়া এক দুর্ভেদ্য অবগুণ্ঠনের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া রাজীবের নিকটে আপনাকে রহস্যময়ী করিয়া

তুলিয়াছে ; রাজীব তাহার নাগাল পায় না, "কেবল একটা মায়াগণ্ডির বাহিরে বসিয়া অতৃপ্ত তৃষিত হৃদয়ে এই সূক্ষ্ম অচল অটল রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে।" এমন সময়

"একদিন বর্ষাকালে শুক্লপক্ষ দশমীর রাত্রে প্রথম মেঘ কাটিয়া চাঁদ দেখা দিল। নিস্পন্দ জ্যোৎস্নারাত্রি সুপ্ত পৃথিবীর শিয়রে জাগিয়া বসিয়া রহিল। সে রাত্রে নিদ্রাত্যাগ করিয়া রাজীবও আপনার জানালায় বসিয়াছিল। গ্রীষ্মক্লিষ্ট বন হইতে একটা গন্ধ এবং ঝিল্লির শান্তরব তাহার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল, অন্ধকার তরুশ্রেণীর প্রান্তে শান্ত সরোবর একখানি মার্জিত রূপার পাতের ন্যায় ঝকমক্ করিতেছে। মানুষ এরকম সময় স্পষ্ট একটা কোনো কথা ভাবে কিনা বলা শক্ত। কেবল তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ একটা কোন দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে, বনের মতো একটা গন্ধোচ্ছ্বাস দেয়, রাত্রির মতো একটা ঝিল্লিধ্বনি করে। রাজীব কি ভাবিল জানিনা, কিন্তু তাহার মনে হইল আজ যেন সমস্ত পূর্ব নিয়ম ভাঙিয়া গিয়াছে। আজ বর্ষারাত্রি তাহার মেঘাবরণ খুলিয়া ফেলিয়াছে ; এবং আজিকার এই নিশীথিনীকে মহামায়ার মতো নিস্তব্ধ সুন্দর এবং সুগম্ভীর দেখাইতেছে। তাহার সমস্ত অস্তিত্ব সেই মহামায়ার দিকে একযোগে ধাবিত হইল।"

তারপর কি করিয়া রাজীবের রহস্য টুটিয়া গেল, মহামায়া একটি উত্তর না দিয়া এক মুহূর্তের জন্য পশ্চাতে না ফিরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, আর তাহার সেই "ক্ষমাহীন চিরবিদায়ের ক্রোধানল রাজীবের সমস্ত ইহজীবনে একটি দগ্ধচিহ্ন রাখিয়া দিয়া গেল" তাহা ত সকলেই জানেন। সমস্ত গল্পটির মধ্যে একটি অপূর্ব রহস্য কি সুন্দর ভয়ংকর রূপে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়া কিরূপে নিবিড়তর বিদায়-রহস্যের মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করিল, ভাবিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। ইহার মধ্যে যে শুধু একটা সবল কল্পনা-শক্তির পরিচয় আছে তাহা নহে, একটা খুব বড় ভাব-লোকের স্পর্শও সমস্ত রহস্যটিকে একটি অপূর্ব অভিব্যক্তি দান করিয়াছে। কিন্তু এই যে গল্পের ঘটনা বর্ণনা ও চরিত্র-চিত্রণের ফাঁকে

ফাঁকে প্রকৃতির সঙ্গে একটা নিবিড় ঐক্যের সৃষ্টি করা, ইহা রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলির একটা বিশেষ কলাকৌশল, এবং ইহার প্রভাবটুকুও অতি চমৎকার। সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়, এবং উপরে যে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছি তাহা হইতে পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করিতে পারিবেন যে এই বিশেষ কৌশলটি অবলম্বনের ফলে প্রত্যেকটি গল্পেরই ঘটনা ও চরিত্র একটি ভাবগাম্ভীর্য, একটি অপূর্ব প্রশান্তি লাভ করিয়াছে।

কিন্তু এই কৌশলটি রবীন্দ্রনাথ সজ্ঞানে আয়ত্ত করিয়াছেন একথা যেন কেহ মনে না করেন। ইহা তাঁহার কবিচিত্তের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিরই ফল; মানুষকে, মানবজীবনের বিচিত্র ঘটনা ও প্রকাশকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেখা তাঁহার কবিহৃদয়ের ধর্ম, ইহাই তাঁহার অদ্ভুত ভাব-লোকধ্যান, যাহার স্পর্শে পৃথিবীর ধুলামাটি, আমাদের ব্যক্তিগত পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের যাহা কিছু তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, দুঃখবেদনায় ব্যথিত, সমস্তই সোনা হইয়া গিয়াছে, অপূর্ব রূপে ও রসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার এই ধ্যানের স্পর্শে, যে-বস্তু লইয়া তাঁহার কারবার, সেই বস্তুরই রূপ অনেক সময় একেবারে বদ্‌লাইয়া গিয়াছে, তাহাকে দেখিয়া আর চেনা যায় না। বরং মনে হয়, কবি বস্তুর যে-রূপ আমাদের দেখাইলেন সেইরূপই তাহার সত্য রূপ। ব্যক্তি-বিশেষের দুঃখকে, কোনও সবিশেষ ঘটনাসংশ্লিষ্ট বেদনাকে তিনি সকলের দুঃখ, সকলের বেদনার মধ্যে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাকে একটা অচঞ্চল শুভ্র, সংযত, শুচিময় অব-সানের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছেন, কোনও ক্ষুব্ধতায় কোনও বিক্ষোভের মধ্যে তাহার সমাপ্তিটুকু আন্দোলিত হইতে দেন নাই। তিনি তাঁহার চরিত্র ও ঘটনা-বস্তুগুলিকে পৃথিবীর ধুলামাটির সঙ্গে সৃষ্টির এক পর্যায়ভুক্ত করিয়া দেখিয়াছেন, এবং মানুষের দুঃখকে বেদনাকে সুখকে শান্তিকে সৃষ্টির সকল বস্তুর দুঃখ ও বেদনা, সুখ ও শান্তি

বলিয়া মনে করিয়াছেন। আগে যে 'কাবুলিওয়ালা', 'পোস্টমাস্টার' ও 'মহামায়া' গল্পের উল্লেখ করিয়াছি তাহাতেই এই কথার ভাল প্রমাণ আছে, কিন্তু সব চেয়ে সুন্দর প্রমাণ আছে 'অতিথি' গল্পটিতে। কিশোর তারাপদ কোথাও স্থির হইয়া থাকে না, কাহারও নিবিড় বন্ধনে বাঁধা পড়ে না; মতিবাবু, অন্নপূর্ণা অথবা চারু কাহারও স্নেহ প্রেম বন্ধুত্বের মধ্যেও সে শেষ পর্যন্ত বাঁধা পড়িল না। তাহার চলিষ্ণু চিত্ত একদিন 'বর্ষার মেঘ-অন্ধকার রাত্রে আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্ব-পৃথিবীর নিকট চলিয়া গেল।' এই সমস্ত স্নেহবন্ধন উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইবার ব্যাপারটির সঙ্গে যে দুঃখ বেদনা জড়িত হইয়া আছে, যে ট্র্যাজেডির আভাস আছে, তাহাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কল্পিত ঘটনাবস্তু ও ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন না, তাঁহার স্বাভাবিক ভাবলোক-বিহারী মন এই চলিয়া যাইবার ব্যাপারটিকে সমস্ত বিশ্বসংসারের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিল।

"দেখিতে দেখিতে পূর্বদিগন্ত হইতে ঘন মেঘরাশি প্রকাণ্ড কালো পাল তুলিয়া দিয়া আকাশের মাঝখানে উঠিয়া পড়িল, চাঁদ আচ্ছন্ন হইল, পুবে বাতাস বেগে বহিতে লাগিল; মেঘের পশ্চাতে মেঘ ফুলিয়া উঠিল, নদীর জল খল খল হাস্যে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল; নদীতীরবর্তী আন্দোলিত বনশ্রেণীর মধ্যে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, ভেক ডাকিতে আরম্ভ করিল, ঝিল্লিধ্বনি যেন করাত দিয়া অন্ধকারকে চিরিতে লাগিল,—সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা, চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে; মেঘ উড়িতেছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে।"

এই দ্রুত চলমান চরাচরের মধ্যে কিশোর তারাপদই বা স্থির হইয়া থাকিবে কেন? ইহাই রবীন্দ্রনাথের কল্পনা, তাঁহার ধ্যানলোকের স্পর্শমণি, যাহার ছোঁয়ায় সকল বস্তু এক অখণ্ড রসপরিণামের মধ্যে সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। বস্তুকে লইয়াই তাহার প্রত্যেক সৃষ্টির সূত্রপাত, কিন্তু তাঁহার কল্পনা বস্তুকে ছাড়াইয়া রসের ঊর্ধ্বলোকে উঠিয়া

গিয়া ভাবলোকের কল্পমায়ার মধ্যে আত্মবিসর্জন করিয়াছে। ইহাই তাঁহার প্রতিভার মূলকথা।

যে কল্পাদর্শের কথা এইমাত্র বলিলাম তাহার স্পর্শ 'দুরাশা' গল্পটিতে একটি সুরাবেগের সঞ্চার করিয়াছে। এই গল্পটির স্বল্প পরিসরের মধ্যে ঘটনাবাহুল্য প্রচুর, তাহার বৈচিত্র্যও কম নয়; কিন্তু বস্তুত গল্পটি দুর্বার অজেয় প্রেমের একটি গীতি-প্রশস্তি মাত্র। একটি সুর যেন প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত স্পন্দিত, শুধু মাঝে মাঝে বাধা পাইয়া যেন আরও দ্বিগুণবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। নিয়ত সংযত শুদ্ধাচারী একটি ব্রাহ্মণের গৌরবর্ণ ধূমলেশহীন জ্যোতিঃশিখার মত সু-উন্নত দেহ ও তাহার দৃপ্ত ব্রাহ্মণ্যের গর্ব এক নবাবপুত্রী মুসলমান দুহিতার মুগ্ধ হৃদয়কে শ্রদ্ধায় ও প্রেমে বিনম্র করিয়া তুলিল। সেই দুর্বার প্রেমে ষোড়শী নবাবপুত্রী অন্তঃপুর ছাড়িয়া বাহির হইল; এবং বাহির হইয়া প্রথমেই তাহার সংসার-দেবতার নিকট হইতে অত্যন্ত নিষ্ঠুর নিষ্করুণ সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইল। কিন্তু প্রেম কিছুতেই পরাভব মানিল না।

"মুহূর্তের মধ্যে সংজ্ঞালাভ করিয়া কঠোর কঠিন নিষ্ঠুর নির্বিকার পবিত্র ব্রাহ্মণের পদতলে দূর হইতে প্রণাম করিলাম—মনে মনে কহিলাম, হে ব্রাহ্মণ! তুমি হীনের সেবা, পরের অন্ন, ধনীর দান, যুবতীর যৌবন, রমণীর প্রেম, কিছুই গ্রহণ কর না; তুমি স্বতন্ত্র, তুমি একাকী, তুমি নির্লিপ্ত, তুমি সুদূর, তোমার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিবার অধিকারও আমার নাই।"

কিন্তু নবাবপুত্রীর প্রেম ব্রাহ্মণের মনে কোনও ভাবান্তর আনিল না; নীরবে সেই ব্রাহ্মণ মুসলমান-দুহিতার সেই পবিত্র প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া গেল। তারপর সেই নবাবদুহিতার সুকঠিন কৃচ্ছ্রসাধনা আরম্ভ হইল। একদিকে সেই ব্রাহ্মণকে খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রয়াস, আর একদিকে নিজের মুসলমানী সংস্কার দূর করিয়া আপনাকে একান্ত করিয়া ব্রাহ্মণ করিয়া তুলিবার অপূর্ব চেষ্টা। দুর্জয় দুর্বার

প্রেমের কাছে কিছুই আর অসম্ভব রহিল না; সে সমস্ত পূর্বসংস্কার ধীরে ধীরে বিসর্জন দিল, সংস্কৃত শিখিল, ভক্তিভরে ব্রাহ্মণের সমস্ত শাস্ত্রপাঠ করিল। ত্রিশ বৎসরের চেষ্টায় সে অন্তরে বাহিরে আচারে ব্যবহারে কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণ হইল।

"আমি মনে মনে আমার সেই যৌবনারম্ভের প্রথম ব্রাহ্মণ, আমার যৌবন-শেষের শেষ ব্রাহ্মণ, আমার ত্রিভুবনের এক ব্রাহ্মণের পদতলে সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া একটি অপরূপ দীপ্তি লাভ করিলাম।"

এই ভাবে সে যখন দেহে এবং মনে প্রতিদিন ও প্রতিমুহূর্তে তাহার আরাধ্য দেবতার নিকটবর্তী হইতেছে, সে যখন ভাবিতেছে তাহার তরী তীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার জীবনের পরমতীর্থ অনতিদূরে, তখন তরী হঠাৎ ডুবিয়া গেল, পরমতীর্থ ধূলিসাৎ হইয়া গেল। সে দেখিল

"বৃদ্ধ কেশরলাল, ভুটিয়া পল্লীতে ভুটিয়া স্ত্রী এবং তাহার গর্ভজাত পৌত্র-পৌত্রী লইয়া ম্লানবস্ত্রে মলিন অঙ্গনে ভুট্টা হইতে শস্য সংগ্রহ করিতেছে।"

বুঝিল, যে-ব্রাহ্মণ্য তাহার কিশোর হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছিল তাহা অভ্যাস, তাহা সংস্কার মাত্র! যে-ব্রাহ্মণ্যের পদতলে সে তাহার সমস্ত জীবন ও যৌবন বিসর্জন দিয়াছে, চরম নিষ্করুণ ব্যর্থতা লইয়া সেই জীর্ণভিত্তি ধূলিশায়ী ভগ্ন ব্রাহ্মণ্যের নিকট সে তাহার শেষ বিদায় গ্রহণ করিল। একটি অপূর্ব ঊর্ধ্বশিখ প্রেমের জ্যোতি যেন হঠাৎ এক ফুৎ-কারে নিবিয়া গেল। সমস্ত গল্পটি যেন একটি মেঘাচ্ছন্ন কাহিনী, একটি দৃপ্ত সুগম্ভীর রাগিণী যেন একটি পরম ব্যথার মধ্যে আত্মবিসর্জিত, একটি গভীর অচঞ্চল আবেগ যেন হঠাৎ মরুমরীচিকার মধ্যে ক্রন্দনরত।

এই ধর্ম শুধু তাঁহার "সাধনা"র যুগে লিখিত, সেই পদ্মাচরের মাধুর্যপূর্ণ জীবনযাত্রার মধ্যে লিখিত গল্পগুলির মধ্যেই আবদ্ধ নয়। বহুদিন পরে লিখিত কয়েকটি গল্পের মধ্যেও এই পরিচয় সহজে পাওয়া যায়।

১৩২১ সালে আশ্বিন ও কার্তিক মাসে লিখিত দুইটি গল্প হইতে এই সুরধর্মের পরিচয় লওয়া যাক্। 'শেষের রাত্রি' গল্পটিতে ঘটনা বা চরিত্র-চিত্রণ বলিতে বিশেষ কিছু নাই, শুধু মাসীর স্নেহ-দুর্বল শঙ্কিত চরিত্রটি একটি অপরূপ মাধুর্যে ফুটিয়াছে। যতীন নিজের মনে নারী-দেবতার একটি পীঠস্থানে তাহার স্ত্রী মণিকে বসাইয়া রাত্রিদিন তাহার প্রেমের পূজা নিবেদন করিতেছে, মণি ফিরিয়াও তাকায় না, বেদনায় যতীনের মন ভরিয়া ওঠে। কিন্তু তাহার আশা পরাভব মানে না, প্রতিমুহূর্তে প্রত্যেক ব্যাপারে সে আত্ম-প্রতারিত; আর মণি যে তাহাকে দূরে রাখিয়াই চলে, একথা জানিলে যতীন দুঃখ পায়, মাসী তাহা জানেন বলিয়া তিনিও মণির মিথ্যা পরিচয়ে যতীনকে প্রতারণা করেন। কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী যতীনের এই আত্মপ্রতারণার মিথ্যা আবরণ প্রায় খসিয়া পড়িতে চলিয়াছে। সেই চরম ক্ষণে সেই রোগ-বিকারের মধ্যেও যতীন তাহার স্খলিতপ্রায় প্রেমের ছদ্মাবরণটি প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছে। কি করুণ দীর্ঘনিঃশ্বাস-ক্ষুব্ধ এই মিথ্যা প্রয়াস। সমস্ত গল্পটির মধ্যে, বিশেষ করিয়া তার পরিসমাপ্তির মধ্যে আশায় ঊর্ধ্বশিখ প্রেমের নিষ্ঠুর ব্যর্থতার একটি করুণ চাপা কান্নার সুর; দুঃখে দুর্বল, ব্যথায় অস্ফুট একটি রাগিণী কি নিবিড় স্পন্দনের মধ্যে অবিরত আহত!

ইহার কয়েকদিন পরে লেখা 'অপরিচিতা' গল্পটিও যেন একটি গানের উচ্ছ্বসিত সুরে বাঁধা। গল্পটির প্রথম পর্বের মধ্যে বিশেষ কিছু নাই—বিবাহের দেনা-পাওনা লইয়া আমাদের সমাজে অহর্নিশ যা ঘটিয়া থাকে তাহারই একটি চিত্র। অবশ্য উহাতে হইতে-পারিত-শ্বশুর শম্ভুনাথের শান্ত অথচ তেজোদৃপ্ত চরিত্রের পরিচয়ের মধ্যে এবং পরে ট্রেনে কল্যাণীর সহজ অথচ দৃপ্ত উজ্জ্বল ব্যবহারের মধ্যে বেশ একটু নৈপুণ্য আছে, সমাজে ইহা নূতনও বটে। কিন্তু গল্পটি তাহার গানের

রূপ লাভ করিয়াছে শেষের পর্বে ; এবং সেই গানের একটি মাত্র ধুয়া, তাহা সেই অপরিচিতার অন্তরতম অনির্বচনীয় কণ্ঠের একটি মাত্র শব্দ, "জায়গা আছে"। কি করিয়া ঘটনাচক্রে চারিবৎসর পরে এক রেলওয়ে স্টেশনে সাতাশ বৎসরের যুবকের সঙ্গে সেই অপরিচিতার দেখা হইয়া গেল, কি করিয়া তাহার মনের মধ্যে সেই অপরিচিতা একটি অখণ্ড আনন্দের মূর্তি ধরিয়া, একটি সুরের রূপ ধরিয়া জাগিয়া উঠিল, কি করিয়া উভয়ের পরিচয় লাভ ঘটিল, কিন্তু তারপরেও দুইজনে কেমন করিয়া আবার মিলনের মধ্যেই বিচ্ছেদকে বরণ করিয়া লইল, গল্পের মধ্যেই তাহার সবিশেষ পরিচয় আছে। কল্যাণী বিবাহে রাজী হইল না, মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিল।

"কিন্তু আমি আশা ছাড়িতে পারিলাম না। সেই সুরটি যে আমার হৃদয়ের মধ্যে আজো বাজিতেছে……। আর সেই যে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে আমার কানে আসিয়াছিল, "জায়গা আছে", সে যে আমার চিরজীবনের গানের ধুয়া হইয়া রহিল। তখন আমার বয়স ছিল তেইশ, এখন হইয়াছে সাতাশ।……তোমরা মনে করিতেছ, আমি বিবাহের আশা করি। না, কোনোকালেই না। আমার মনে আছে, কেবল সেই একরাত্রির অজানা কণ্ঠের মধুর সুরের আশা—"জায়গা আছে। নিশ্চয়ই আছে" ; নইলে দাঁড়াইব কোথায় ? তাই বৎসরের পর বৎসর যায়,—আমি এইখানেই আছি।……ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না ; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো এইতো আমি জায়গা পাইয়াছি।"

বাস্তব জীবনে কি হয় জানিনা, হয়ত সেখানে সমস্ত জীবন অন্যরকম সমাপ্তিলাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হয়। কিন্তু যে ভাবলোকধ্যান এই গল্পটিতে প্রকাশ পাইয়াছে, সাহিত্যে তাহার মূল্য যে আছে, এই গল্পটিই তাহার প্রমাণ। গল্পের এমন গীতিমাধুর্য, এমন অপূর্ব রস-পরিণতি এমন অপরূপ সুরসমাপ্তি আমি অন্য কোনও ছোটগল্পের মধ্যে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

একান্তভাবে গীতধর্মী গল্পগুলি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের একশ্রেণীর কয়েকটি বিশেষ গল্প আছে, যাহার মধ্যেও এই সুরধর্মই বিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এইগল্পগুলিতেও প্লট্ বা আখ্যানভাগ বলিতে কিছুই নাই; থাকিলেও তাহার মূল্য খুব বেশি কিছু নয়; সমস্ত কাহিনীটিকে, আখ্যান ভাগটিকে ছাড়াইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে মনের একটা বিশেষ 'মুড্', মানসিক বিকৃতির একটা অপূর্ব গীতিময় প্রকাশ; অন্তত "নিশীথে" ও "ক্ষুধিত পাষাণ" গল্পে এই গীতিধর্মই সব কিছুকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে এই গল্পগুলির একটা বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। এবং সেইদিক হইতে আলোচনা করিয়া শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয় এই গল্পগুলিকে একটি বিশেষ পর্যায়ভুক্ত করিয়াছিলেন। আমাদের প্রতিদিনের বাস্তব-জীবনের মধ্যে অতীন্দ্রিয় অতিপ্রাকৃত ভৌতিক রহস্যের আবির্ভাব ও অভিব্যক্তিই সেই উপাদান। শ্রীকুমার বাবু এই উপাদান লইয়া রচিত গল্পগুলির খুব চমৎকার আলোচনা করিয়াছেন, বলিয়াছেন—

"সাধারণ বাঙালীজীবনের সহিত অতি-প্রাকৃতের সংযোগ-সাধন এক দিক দিয়া বিশেষ সহজ, অপর দিক দিয়া বিশেষ আয়াসসাধ্য। সহজ এই জন্য যে, আমাদের মধ্যে এখনও কতকগুলি বিশ্বাস ও সংস্কার সজীব ভাবে বর্তমান আছে, যাহাদের অতি-প্রাকৃতের প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। আবার অন্য দিকে, আমাদের সাধারণ জীবন এতই বিশেষত্বহীন ও ঘটনাবিরল, যে ইহার মধ্যে মনো-বিজ্ঞানসম্মত উপায়ের দ্বারা অতি-প্রাকৃতের অবতারণা নিতান্ত দুরূহ। রবীন্দ্রনাথের গল্পমধ্যে উভয়বিধ গল্পেরই উদাহরণ মিলে।"

কিন্তু উপাদান লইয়া সাহিত্য নয়, উপাদান বিশ্লেষণ দ্বারা সাহিত্য-সৃষ্টিকে ভোগও করিতে পারি না। আমি বুঝিতে চাই লেখকের মনের সেই বিশেষ ধর্মটিকে, তাহার বিশেষ ভঙ্গিটিকে যাহার সহায়তায় সেই উপাদান একটা রসময় রূপ লাভ করে। সেইদিক হইতে দেখিলে

এই ধরনের গল্পগুলিকে একটি বিশেষ পর্যায়ভুক্ত করিবার কারণ কিছু নাই ; কারণ যে সুরধর্ম যে কল্পনার ঐশ্বর্য রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গল্পে এ পর্যন্ত আমরা দেখিলাম, অতি-প্রাকৃত ভৌতিক রহস্যাবৃত এই গল্প-গুলিতেও সেই সুরধর্ম, সেই কল্পনার ঐশ্বর্যই বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু তাহাই নয় ; ইহার উপরে কলাকৌশলের দিক হইতেও রবীন্দ্রনাথের একটা বৈশিষ্ট্য এই গল্পগুলিতে সহজে লক্ষ্য করা যায়। শ্রীকুমারবাবু সত্যই বলিয়াছেন, বাস্তব জীবনের সহিত অতি-প্রাকৃতের সমন্বয়-সাধন অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার ; তিনি দেখাইয়াছেন, এ বিষয়ে ইংরেজী সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী কোলরিজকেও

"অতি-প্রাকৃতের উপযুক্ত ক্ষেত্র রচনা করিতে অনেক প্রয়াস পাইতে হইয়াছে,—নৈসর্গিকের সীমা লঙ্ঘন করিতে হইয়াছে, শরীরী প্রেতের আবির্ভাব ঘটাইতে হইয়াছে। * * * যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে তাঁহাকে এই অনৈসর্গিকের অবতারণা করিতে হইয়াছে তাহাতেও অজ্ঞাত অপরিচিতের সুদূর রহস্য মাখানো * * * পরিচিতমণ্ডলীর মধ্যে আসিয়া তাহাকে মায়া-তরী ডুবাইতে হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য কুহকবলে আমাদের অতিপরিচিত গৃহাঙ্গনের মধ্যে অতি-প্রাকৃতকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন এবং নৈসর্গিকের সীমা ছাড়াইয়া এক পদও অগ্রসর হন নাই।"

এই ধরনের গল্প রবীন্দ্রনাথের খুব বেশি নাই। গল্পরচনার আদিপর্বে লেখা 'সম্পত্তিসমর্পণ' ও কয়েক বৎসর পরে লেখা 'গুপ্তধন' গল্প দুটি নিতান্তই আমাদের সহজ ভৌতিক বিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার মধ্যে বিশেষ কোন কলাকৌশল, কল্পনার কোন সমৃদ্ধি প্রকাশ পায় নাই ; শুধু গল্প বলিবার জন্যই যেন এই গল্পগুলির রচনা, রসসৃষ্টির কোন প্রয়াস এই গল্পগুলির মধ্যে বিরল ; অতীন্দ্রিয় অনৈসর্গিকের রহস্য কিছু নিবিড় হইয়া উঠিয়া মনের মধ্যে মায়াজালের সৃষ্টি করে না। 'কঙ্কাল' গল্পটিতে এই মায়াজাল-সৃষ্টির প্রয়াস তবু

কতকটা দেখা যায়, কিন্তু তাহাও একটি রূপযৌবনগর্বিতা প্রেমমুগ্ধা মৃতা-নারীর বিগতজীবনের কাহিনীমাত্র। যে মৃতানারী এক সুষুপ্ত যুবকের মস্তিষ্কবিকৃতির মধ্যে আবির্ভূত হইয়া এই কাহিনী যুবককে শুনাইতেছে, তাহার কথাবার্তায়, হাসিতে, ইঙ্গিতে মৃত্যুলোকের সেই সুগভীর ভয়-শিহরণ ও অতীন্দ্রিয় রহস্য নিবিড় হইয়া ফুটিয়া উঠে নাই। 'জীবিত ও মৃত' গল্পটিও কতকটা এইরূপ, যদিও সেখানে কাদম্বিনীর মনো-বিকারের কাহিনীটুকু একটু জটিল ও অদ্ভুত। লেখকের কল্পনা কাদম্বিনীর মানসিক বিকৃতির স্বরূপটিকে আবিষ্কার করিয়াছে সত্য, কিন্তু খানিকটা অসাধারণ বলিয়াই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক এই মনোবিকৃতির রহস্যটুকু খুব বুদ্ধি ও ভাবগ্রাহ্য হইয়া পাঠকের মনকে অধিকার করিয়া বসে না, তাহার মনকে কল্পনার রসে অভিষিক্ত করিয়া দেয় না। বাড়ির লোকেরা জানে কাদম্বিনী মরিয়াছে, শ্মশানে তাহার দেহ ভস্মীভূত হইয়াছে; এবং শ্মশান-প্রত্যাগতা কাদম্বিনী নিজেও নিজকে মৃত বলিয়াই মনে করিতেছে, ভাবিতেছে 'আমি তো বাঁচিয়া নাই, আমাকে বাড়িতে লইবে কেন?...জীবরাজ্য হইতে আমি যে নির্বাসিত হইয়া আসিয়াছি. আমি যে আমার প্রেতাত্মা।' আর যেখানেই সে যাইতেছে, সেখানে ত সকলেই তাহাকে প্রেতাত্মা বলিয়াই মনে করিতেছে। কিন্তু এমন করিয়া প্রতিদিন প্রতি কার্যে প্রতি ঘটনায় জীবিতের সঙ্গে মৃতের সংঘর্ষ কাদম্বিনী কেমন করিয়া সহিবে, সহিয়া কেমন করিয়া মৃতের মতন হইয়া বাঁচিয়া থাকিবে? কাজেই অবশেষে তাহাকে মরিয়া প্রমাণ করিতে হইল যে সে মরে নাই। সুকৌশল ঘটনা-সন্নিবেশে গল্পটির সমগ্র আখ্যানভাগ সুন্দর দানা বাঁধিয়াছে, বিশেষ করিয়া জীবিতের সঙ্গে মৃতের সংঘর্ষের ট্রাজেডির শেষ অধ্যায়টুকু, যেখানে কাদম্বিনী অনেক দিন পরে অনুভব করিল যে, সে মরে নাই—সেই পুরাতন ঘরদ্বার, সেই সমস্ত, সেই খোকা,

সেই স্নেহ, তাহার পক্ষে সমান জীবন্তভাবেই আছে, মধ্যে কোনও বিচ্ছেদ কোনও ব্যবধান জন্মায় নাই। তৎসত্ত্বেও গল্পটির অনুভূতি পাঠকের মনকে মৃত্যুকালের অশরীরী কোনও ভয়াবহ রহস্যে কম্পিত করে না, চিত্তকে নিবিড় কল্পনারসে ভরিয়া দেয় না।

এই ধরনের গল্পগুলির মধ্যে সবচেয়ে রসঘন ও রহস্য-নিবিড় গল্প 'ক্ষুধিত পাষাণ'। প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে, এই বিশেষ ধরনের গল্পের এমন অপূর্ব কলাকৌশল, রহস্য-নিবিড় বর্ণনা-ভঙ্গি অপরূপ কল্পনার ঐশ্বর্য, সর্বোপরি এমন উচ্ছ্বসিত সুরপ্রবাহ দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারি না। শ্রীকুমারবাবু সত্যই বলিয়াছেন 'ভাষার ধ্বনি, ব্যঞ্জনা ও সাংকেতিকতায় এক De Quincey-র "Dream Visions" ভিন্ন রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণে'র অনুরূপ কিছু ইংরেজী সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর।' গল্পটির পরিবেশ রচিত হইয়াছে শুস্তা নদীর তীরে বরীচ নগরে আড়াই-শ বছর আগেকার তৈরি দ্বিতীয় শা' মামুদের ভোগবিলাসের নির্জন প্রাসাদে। তাহার কক্ষে একদিন

'অনেক অতৃপ্ত বাসনা, অনেক উন্মত্ত সম্ভোগের শিখা আলোড়িত হইয়াছে। সেই সকল চিত্তদাহে সেই সকল নিষ্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত হইয়া আছে; সজীব মানুষ পাইলে তাহাকে লালায়িত পিশাচীর মতন খাইয়া ফেলিতে চায়।'

এমনই রহস্যময় পরিবেশের মধ্যে লেখকের কল্পনা ছাড়া পাইয়াছে। সেই অবাধ কল্পনা ও সংগীত-প্রবাহের মধ্যে যেন অবাস্তব কোথাও কিছু নাই, অস্পষ্ট কুহেলিকার আবরণ যাহা কিছু বা ছিল সব ঘুচিয়া গিয়াছে। তুলার মাশুল-আদায়কারী নির্জন প্রাসাদবাসী যে ভদ্রলোকটি এই গল্পের নায়ক, সূর্যাস্তের পর হইতে সে যেন আর নিজের মধ্যে থাকে না, মোগলাই-খানা খাইয়া, ঢিলা পায়জামা, মখমলের ফেজ, দীর্ঘচোগা, ও ফুলকাটা কাবা পরিয়া, রুমালে আতর মাখিয়া,

'শত শত বৎসরের পূর্বেকার কোনো এক অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত আর একটি অপূর্ব ব্যক্তি হইয়া উঠে, একটা নেশার জালের মধ্যে বিহ্বলভাবে জড়াইয়া পড়ে।'

তখন, সম্মুখে শুস্তার জলে বিজন প্রাসাদের সিঁড়িতে, তাহার কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে এক রহস্যময় ইন্দ্রজাল বিস্তৃত হয়। এক একটি রাত্রি যেন এক একটি স্বপ্নময় নিরবচ্ছিন্ন সংগীত; বুঝি এই স্বপ্ন এই সংগীতের শেষ কোথাও হইত না যদি প্রতিদিন প্রত্যূষে জনশূন্য পথে পাগলা মেহের আলীর 'তফাৎ যাও, তফাৎ যাও', চীৎকার এই নিরবচ্ছিন্ন স্বপ্ন ও সংগীতপ্রবাহের মধ্যে অকস্মাৎ একটা বাধার মতন আসিয়া নিক্ষিপ্ত না হইত। প্রতিরাত্রির স্বপ্ন-সংগীতের আবর্তের মধ্যে সেই বহুদিনবিস্মৃত বাদশাহী ঐশ্বর্যের দীপ্তি ও লালসা, অতৃপ্ত কামনা ও সম্ভোগের ক্ষুব্ধ হতাশ যেন সব সজীব মূর্তি ধরিয়া সেই বিজন প্রসাদের কক্ষে কক্ষে জাগিয়া বসিয়া আছে, তাহার মধ্যে মায়া বা বিভ্রম কোথাও কিছু নাই। এই অপূর্ব কল্পনার পাখার উপর ভর করিয়া একটির পর একটি রাত্রি যেন স্বপ্ন-সংগীতের মালা গাঁথিয়া চলিয়াছে। গল্পের মধ্যে কোন্ কবির কল্পনা এমন করিয়া শতদল মেলিয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, এমন সংগীতপ্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া ছুটিয়াছে? এই কল্পনার ঐশ্বর্য, এই সুরধর্মই 'ক্ষুধিত পাষাণ'কে এমন রসময় ভাষারূপ দান করিয়াছে; তাহার উপাদান এক্ষেত্রে তুচ্ছ। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত না দিয়া পারিলাম না।

"আবার সেইদিন অর্ধরাত্রে বিছানার মধ্যে উঠিয়া বসিয়া শুনিতে পাইলাম কে যেন গুমরিয়া বুক ফাটিয়া ফাটিয়া কাঁদিতেছে, যেন আমার খাটের নীচে এই বৃহৎ প্রাসাদের পাষাণ ভিত্তির তলবর্তী একটা আর্দ্র অন্ধকার গোরের ভিতর হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও—কঠিন মায়া, গভীর নিদ্রা নিষ্ফল স্বপ্নের সমস্ত দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তুমি আমাকে ঘোড়ায়

তুলিয়া তোমার কাছে চাপিয়া ধরিয়া বনের ভিতর দিয়া পাহাড়ের উপর দিয়া নদী পার হইয়া তোমাদের সূর্যালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও! আমাকে উদ্ধার কর।

"আমি কে! আমি কেমন করিয়া উদ্ধার করিব! আমি এই ঘূর্ণমান পরিবর্তমান স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন্ মজ্জমান কামনা-সুন্দরীকে টানিয়া তুলিব! তুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে হে দিব্যরূপিণী! তুমি কোন্ শীতল উৎসের তীরে খর্জুর কুঞ্জের ছায়ায় কোন্ গৃহহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে? তোমাকে কোন্ বেদুইন দস্যু বনলতা হইতে পুষ্পকোরকের মত মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া বিদ্যুৎগামী অশ্বের পৃষ্ঠে চড়াইয়া জ্বলন্ত বালুকারাশি পার হইয়া কোন্ রাজপুরীর দাসীহাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল! সেখানে কোন্ বাদশাহের ভৃত্য তোমার নববিকশিত সলজ্জ কাতর যৌবনশোভা নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্ণমুদ্রা গণিয়া দিয়া সমুদ্র পার হইয়া তোমাকে সোনার শিবিকায় বসাইয়া প্রভুগৃহের অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছিল! সেখানে সে কি ইতিহাস! সেই সারংগীর সংগীত, নূপুরের নিক্কণ, এবং সিরাজের সুবর্ণমদিরার মধ্যে মধ্যে ছুরির ঝলক, বিষের জ্বালা কটাক্ষের আঘাত! কি অসীম, কি ঐশ্বর্য, কি অনন্ত কারাগার! দুইদিকে দুই দাসী বলয়ের হীরকে বিজুলি খেলাইয়া চামর দুলাইতেছে; শাহেন্‌শা বাদশা শুভ্র চরণের তলে মণিমুক্তাখচিত পাদুকার কাছে লুটাইতেছে;—বাহিরের দ্বারের কাছে যমদূতের মতো হাবশী, দেবদূতের মতো সাজ করিয়া খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া। তাহার পরে সেই রক্তকলুষিত ঈর্ষাফেনিল ষড়যন্ত্রসংকুল ভীষণোজ্জ্বল ঐশ্বর্যপ্রবাহে ভাসমান হইয়া তুমি মরুভূমির পুষ্পমঞ্জরী কোন্ নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে অবতীর্ণ অথবা কোন্ নিষ্ঠুরতর মহিমাতটে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলে?"

কি অপূর্ব এই প্রশস্তি সংগীত! এমনই সংগীত-প্রবাহ চলিয়াছে এক রাত্রি হইতে অন্য রাত্রিতে। তাহার বর্ণনার ভঙ্গিতে, ভাষার ধ্বনিতে, শব্দের চয়নে কি সুন্দর সুর, কি অপরূপ মাধুর্য! প্রত্যেকটি বাক্যে, তাহার ইঙ্গিতে ও ব্যঞ্জনায় কত কথা কত ইতিহাস যেন প্রাণ পাইয়া সজীব হইয়া উঠিয়াছে। কলাকৌশলের দিক হইতে গল্পের 'সেটিং'টিও খুব লক্ষ্য করিবার। ইহার আরম্ভিক ভূমিকা যেমন স্বল্পপরিসর, ইহার

সমাপ্তিও তেমনি আকস্মিক ; অন্য গাড়ি আসিবার অবসরে, স্টেশনের বিশ্রামকক্ষে এই গল্প-বর্ণনার সূত্রপাত, সেইখানেই ইহার আকস্মিক সমাপ্তি। খাঁটি গল্পভাগের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ খুব অল্পই ; গল্পের আরম্ভ ও সমাপ্তির জন্য পাঠককে কিছু প্রস্তুত হইতে হয় না। রং ও রেখায় দীপ্ত সবল সুন্দর একটি ছবি যেন কাঠের কঠিন ও সুনির্দিষ্ট একটি ফ্রেমের মধ্যে বাঁধা পড়িয়াছে।

'নিশীথে' গল্পটি আরও সহজ ও স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে ; উহার জন্য কোনও বিজন প্রাসাদ বা কোনও অতীত যুগের মধ্যে কল্পনাকে পক্ষমুক্ত করিতে হয় নাই। আমাদের প্রতিদিনের অতি সহজ কথা এবং কাজ কর্মের মধ্যেই কেমন করিয়া অতীন্দ্রিয় অতি-প্রাকৃত জগতের মায়াজাল বিস্তৃত হয়, দৈনন্দিন তুচ্ছ একান্ত স্বাভাবিক কথা ও কর্মকে আশ্রয় করিয়া অতি-প্রাকৃতের স্পর্শ আকস্মিক একটা সাময়িক মনোবিকার ঘটাইয়া দেয়, এবং তাহাকেই অবলম্বন করিয়া কবির কল্পনা সমস্ত আখ্যানটিকে রসে রহস্যে সুনিবিড় করিয়া তোলে, এই গল্পটি তাহার একটা সরস ও প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।| রুগ্না স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কোনো এক উদ্বেলিত মুহূর্তে স্বামীর পক্ষে বলা সহজ "তোমার ভালোবাসা আমি কোনও কালে ভুলিব না"। কিন্তু কথাটা শুনিয়া রুগ্না স্ত্রীও হা হা করিয়া সুতীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়া উঠিয়াছিল। সে হাসির মধ্যে স্ত্রীর লজ্জা ও সুখের অনুভূতি একটু হয়ত ছিল, কিন্তু তাহার চেয়ে বেশি ছিল অবিশ্বাস ও পরিহাসের তীব্রতা! সেই এক বিহ্বল মুহূর্তের কথাটা যে কত মিথ্যা তাহা ধরা পড়িয়া গেল রুগ্না স্ত্রীর মৃত্যুশয্যার আড়ালে নূতন প্রেমের সঞ্চারে, গোপনে গোপনে নূতন করিয়া নূতন মানুষের সঙ্গে প্রেমের লীলায়। মৃত্যুশয্যাশায়িনীর চোখেও বুঝি বা তাহা ধরা পড়িয়াছিল, তাহার হৃদয়ের ডাঁটায় বুঝি বা টান পড়িয়াছিল। তাই, মনোরমা যখন তাহাকে দেখিতে আসিল,

রুগ্না অবহেলিতা স্ত্রী চম্‌কিয়া উঠিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ও কে? ও কে, ও কেগো?" স্ত্রী ত মরিল; স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহও করিল। কিন্তু প্রথমা স্ত্রীর প্রতি অবহেলা, অপরাধ ও মিথ্যাচরণের গুরুভার তাহার বুকের উপর অনুক্ষণ চাপিয়া রহিল, মনোরমাও সহজভাবে স্বামীকে গ্রহণ করিতে পারিল না।

"আমি যখন আদরের কথা বলিতাম প্রেমালাপ করিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিতে চেষ্টা করিতাম, মনোরমা হাসিত না গম্ভীর হইয়া থাকিত। তাহার মনের কোথায় কি খট্‌কা লাগিয়াছিল, আমি কেমন করিয়া বুঝিব?"

কিন্তু তবু আর এক বিহ্বল মুহূর্তে বলিতে হইল, "মনোরমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না, কিন্তু তোমাকে আমি ভালবাসি, তোমাকে কোনওকালে আমি ভুলিতে পারি না।" এই কথা শুনিয়াই একদিন রুগ্না প্রথমা স্ত্রী অবিশ্বাস ও পরিহাসের সুতীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়াছিল। আবার যখন সেই কথাটিই নূতন করিয়া দ্বিতীয়া স্ত্রীকে প্রেম জানাইবার জন্য নিবেদন করিতে হইল, তখন এক মুহূর্তেই তাহার নিজের মিথ্যা নিজের ফাঁকি নিজের কাছেই অত্যন্ত ক্রূর নিষ্ঠুর রহস্য লইয়া উন্মুক্ত হইয়া পড়িল; এবং পরক্ষণেই একটা অতীন্দ্রিয় ভৌতিক শিহরণে নিজেই কাঁপিয়া উঠিল, একটা মানসিক বিকার তাহার সমস্ত সত্তাকে অধিকার করিয়া বসিল। সেই মুহূর্তেই 'বকুল গাছের শাখার উপর দিয়া, ঝাউ গাছের মাথার উপর দিয়া কৃষ্ণপক্ষের পীতবর্ণ ভাঙা চাঁদের নিচ দিয়া গঙ্গার পূর্বপার হইতে পশ্চিম পার পর্যন্ত সেই অবিশ্বাস ও পরিহাসের হাহা-হাহা-হাহা হাসি দ্রুতবেগে বহিয়া গেল।' আর সেই যে মৃত্যুপথযাত্রিনীর 'ও কে, ও কে, ও কে গো' প্রশ্ন তাহাও অনুতপ্ত অপরাধগ্রস্ত স্বামীকে অব্যাহতি দিল না। এই যে প্রেমবিহ্বল স্বামীর পাশে পাশে নবপরিণীতা নূতন স্ত্রী, আকাশ বাতাস পথ ঘাট বিশ্ব-

জগতের যাহা কিছু সবই যেন উহার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কেবলি প্রশ্ন করিতেছে, ও কে, ও কে, ও কে গো? নির্জন পদ্মার চর পর্যন্ত সেই এক হৃদয়বিদারক প্রশ্ন তাহাকে অনুসরণ করিয়া চলিল; জনমানবশূন্য নিঃসঙ্গ মরুভূমিতে শুনা যায় ও কে, ও কে, ও কেগো? রাত্রির অন্ধকার সুষুপ্তির মধ্যে কে যেন অস্ফুটকণ্ঠে কেবলই জিজ্ঞাসা করিতে থাকে ও কে, ও কে, ও কেগো? কি অপূর্ব সহজ ও স্বাভাবিক এই ভৌতিক শিহরণ! অতি-প্রাকৃতের এই স্পর্শ দৈনন্দিন জীবনে আমরা কতই না অনুভব করিয়া থাকি। এক একটা ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া তুচ্ছ এক একটা কথা, একটা ছবি, এমন অনপনেয় রেখায় আমাদের মনের পটে আঁকা হইয়া যায়, মনকে এমন গুরুভারে পীড়িত করিয়া মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটায়—তখন সেই কথা সেই ছবিটাই যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহার প্রতিধ্বনি ও প্রতিচ্ছবি যেন সকলদিক হইতে সমস্ত জীবনকে চাপিয়া ধরিয়া মৌন আর্তনাদে উৎপীড়িত করে, কিছুতেই তার হাত হইতে মুক্তি পাওয়া যায় না। 'নিশীথে'র গল্পভাগ এই প্রকার মনোবিকৃতি হইতেই উদ্ভূত, কিন্তু লেখকের সুদূরবিসর্পী কল্পনার ঐশ্বর্য, তাঁহার স্বাভাবিক কবিচিত্তের সুরধর্ম ইহাকে একটি অতুলনীয় রসময় রহস্যঘন রূপ দান করিয়াছে। এই অতি-প্রাকৃতের শিহরণ যখন এক একটা চূড়ায় আসিয়া উঠিয়াছে, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির উঁচু পর্দায় আসিয়া চড়িয়াছে, সেই-খানেই এই কল্পনার মুক্তগতি ও সহজ সুরধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়—ম্লান জ্যোৎস্নালোকিত শুভ্র বকুলবেদীতে, জনমানবশূন্য নিঃসঙ্গ পদ্মাচরের উপর, অথবা অন্ধকার রাত্রিতে বোটের মধ্যে মশারির নিচে। শেষ দৃষ্টান্তটি মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

"তখন অন্ধকারে কে একজন মশারির কাছে দাঁড়াইয়া সুষুপ্ত মনোরমার দিকে একটি মাত্র দীর্ঘ শীর্ণ অস্থিসার অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া যেন আমার কানে কানে

অত্যন্ত চুপি চুপি অস্ফুটকণ্ঠে কেবলি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ও কে? ও কে? ও কে গো?"—

"তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশলাই জ্বালাইয়া বাতি ধরিলাম। সেই মুহূর্তেই মিলাইয়া গিয়া, আমার মশারি কাঁপাইয়া, বোট দুলাইয়া, আমার সমস্ত ঘর্মাক্ত শরীরের রক্ত হিম করিয়া দিয়া হাহা-হাহা একটা হাসি অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল। পদ্মা পার হইল, পদ্মার চর পার হইল, তাহার পরবর্তী সমস্ত সুপ্ত দেশ গ্রাম, নগর, পার হইয়া গেল—যেন তাহা চিরকাল ধরিয়া দেশদেশান্তর লোক-লোকান্তর পার হইয়া ক্রমশ ক্ষীণ, ক্ষীণতর, ক্ষীণতম হইয়া অসীম সুদূরে চলিয়া যাইতেছে,—ক্রমে যেন তাহা জন্মমৃত্যুর দেশ ছাড়াইয়া গেল—ক্রমে যেন তাহা সূচীর অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষীণতম হইয়া আসিল—এত ক্ষীণ শব্দ কখনো শুনি নাই, কল্পনা করি নাই, আমার মাথার মধ্যে যেন অনন্ত আকাশ রহিয়াছে এবং সেই শব্দ যতই দূরে যাইতেছে, কিছুতেই আমার মস্তিষ্কের সীমা ছাড়াইতে পারিতেছে না; অবশেষে যখন একান্ত অসহ্য হইয়া আসিল, তখন ভাবিলাম, আলো নিবাইয়া না দিলে ঘুমাইতে পারিব না। যেমনি আলো নিবাইয়া শুইলাম অমনি আমার মশারির পাশে, আমার কানের কাছে, অন্ধকারে আবার সেই অবরুদ্ধ স্বর বলিয়া উঠিল,—ও কে, ও কে, ও কে গো! আবার আমার বুকের রক্তের ঠিক সমান তালে ক্রমাগতই ধ্বনিত হইতে লাগিল,—ও কে, ও কে, ও কে গো! সেই গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ বোটের মধ্যে আমার গোলাকার ঘড়িটাও সজীব হইয়া উঠিয়া তাহার ঘণ্টার কাঁটা মনোরমার দিকে প্রসারিত করিয়া শেল্‌ফের উপরও হইতে তালে তালে বলিতে লাগিল ও কে, ও কে, ও কে গো! ও কে, ও কে, ও কে গো!"

অতি-প্রাকৃতের এই ভৌতিক শিহরণ সঞ্চারের সার্থক প্রয়াস 'মণিহারা' গল্পেও দেখিতে পাই। পত্নীপ্রেমবঞ্চিত স্বামীর পত্নীবিয়োগে শোকভারগ্রস্ত চিত্তের বিকার হইতেই এই গল্পের সৃষ্টি; কিন্তু ইহার মধ্যে যে অতীন্দ্রিয় ভৌতিক রহস্য তাহা অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে গল্পের শেষ দিকে। এবং সেখানেও যে এই অতীন্দ্রিয় অতি-প্রাকৃতের রহস্য খুব নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে, এমন মনে হয় না; কল্পনার ঐশ্বর্যও খুব দীপ্তি লাভ করিতে পারে নাই, কল্পনার সাংকেতিকতায়

অতীন্দ্রিয়ের অনুভূতিও খুব উঁচু পর্দায় পৌঁছিতে পারে নাই। তবে গল্পের প্রথমভাগে ফণীভূষণ ও মণিমালিকার পরস্পরের হৃদয়লীলার পরিচয়ের মধ্যে লেখকের সুতীক্ষ্ণ মনোবিশ্লেষণ-ক্ষমতা ও সহজ বোধ-শক্তির আশ্চর্য প্রমাণ আছে। ইহা ছাড়া, শ্রীকুমারবাবু খুব নিপুণতার সহিত গল্পটির আর একটি বিশেষত্বের দিক ইঙ্গিত করিয়াছেন, যাহা একটু মনোযোগী পাঠকমাত্রের চোখে ধরা না পড়িয়াই পারে না। তাহা এই,

"এই তুষার-শীতল, মৃত্যুরহস্যগূঢ় স্বপ্নকাহিনীর চারিদিকে একটা ইস্পাতের মত শক্ত বাস্তবতার বন্ধন দেওয়া হইয়াছে। এই অদ্ভুত স্বপ্নবৃত্তান্ত যিনি বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহার চক্ষে স্বপ্নজড়িমার লেশমাত্র নাই, বরঞ্চ একটা তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণশক্তি শাণিত ছুরিকাগ্রভাগের ন্যায় চক্ চক্ করিতেছে। স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের সম্বন্ধের মধ্যে আদিম রহস্য ও বর্তমান যুগের সমাজে সেই সনাতন নীতির বৈপরীত্য—এই অতি গভীর চিন্তাশীলতাপূর্ণ আলোচনার মধ্যে, বুদ্ধি তর্কের অতীত অতীন্দ্রিয় জগতের ভয়াবহ ইঙ্গিতটি আশ্চর্য সুসংগতির সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গল্পের উপসংহারটিও আবার বাস্তব সত্যকে প্রাধান্য দিয়া একটা সংশয়াকুল সন্দেহবিজড়িত অনিশ্চয়ের মধ্যে গল্পটিকে হঠাৎ শেষ করিয়া দিয়াছে।"

(৩)

কিন্তু গীতিমাধুর্য অথবা সুরধর্ম এবং কল্পনার ঐশ্বর্যই রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলির একমাত্র বিশেষত্ব নয়। কতগুলি গল্পের মধ্যে আছে—এবং তাহাদের সংখ্যা কম নয়—লেখকের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, সহজ অনুভূতি, এবং অপরূপ মনোবিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয়। মানব-হৃদয়ের প্রেমের প্রবাহ যেখানে ফল্গুসম গোপন, জীবনযাত্রার বাঁকে বাঁকে জটিল, সামাজিক ও পারিবারিক বিধিনিষেধ রীতিবন্ধনের মধ্যে যেখানে মানুষের সহজ ও স্বাভাবিক হৃদয়-বৃত্তির বিচিত্র লীলাগুলি আহত ও সংকুচিত, শঙ্কিত ও বাধাপ্রাপ্ত, সেখানেও কবি তাঁহার সহজ সহানুভূতি

দিয়া, অন্তর্দৃষ্টি দিয়া, একান্ত আত্মীয়তা-বোধের সাহায্যে গল্পের উৎসের সন্ধান পাইয়াছেন, এবং অপরূপ মনোবিশ্লেষণ ক্ষমতার সহায়তায় স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র লীলার যথার্থ স্বরূপ ও তাহার বিকাশ আমাদের চোখের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন। আমাদের সমাজে ও পরিবারে হৃদয়বৃত্তির যত লীলা প্রায় সবই প্রকাশ পায় কতকগুলি অতি পরিচিত সমাজসম্মত সম্বন্ধের মধ্যে, তাহার স্রোত বহিয়া চলে কতকগুলি বাঁধাধরা খাতের মধ্য দিয়া। কিন্তু এই পরিচিত বাঁধাধরার মধ্যেও মাঝে মাঝে এমন একটি সহজ স্বাভাবিক, অথচ অপ্রত্যাশিত সম্বন্ধের সৃষ্টি হয়, এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া আমাদের ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ জীবনধারা এমনভাবে আন্দোলিত হয় যে, তাহার মধ্যে ছোট গল্পের উৎসের সন্ধান পাওয়া কিছু বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। পল্লী-জীবনের যে আবেষ্টন ও পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গল্প-রচনার সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই পল্লীজীবনই আমাদের পরিবার ও সমাজে হৃদয়বৃত্তির এই বিচিত্র লীলার বিচিত্রতর প্রকাশের দিকে তাঁহার কবিচিত্তকে আকর্ষণ করিল। ('দেনা-পাওনা' গল্পটি ১২৯৮ সালে 'পোস্টমাস্টার' গল্পটিরও আগেকার লেখা। গল্পটির বিশেষ কিছু সাহিত্য-মূল্য যে আছে, এমন নয়। তবু এই গল্পটির উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে গল্পরচনার সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের পরিবার ও সমাজের নানান বিধানের ফলে ব্যক্তিজীবনে যে নিদারুণ দুঃখ ও বেদনা জমা হইয়া আছে তাহা কবিচিত্তে কি ভাবে রসসঞ্চার করিয়াছে, তাহার একটি প্রথমতম দৃষ্টান্ত হিসাবে। 'দেনা-পাওনা'র মতন আরও দুই চারিটি গল্পে ঠিক এই জিনিসের পরিচয় আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের রসবৈশিষ্ট্য ইহাদের মধ্যে তেমন করিয়া ফুটিয়া উঠিবার অবসর পায় নাই।) অথচ অতি সহজ একটি হৃদয়বৃত্তি নিষ্করুণ হেলা ও বিদ্রূপে যে কি অসহায়ভাবে পীড়িত ও

লজ্জিত হয়, তাহার অতি সুন্দর পরিচয় আছে 'গিন্নি' নামক ছোট গল্পটিতে। স্বভাবতঃই লাজুক মুখচোরা বালক আশু একদিন তাহার একান্ত স্নেহের ছোট বোনটির সঙ্গে বসিয়া একমনে পুতুল খেলিতেছিল; এমনই তাহার দুর্ভাগ্য, তাহার ইস্কুলের পণ্ডিতমশাই সেই অবস্থায় তাহাকে দেখিয়া ফেলিলেন। বোনের সঙ্গে বসিয়া পুতুলখেলার মধ্যে স্নেহলীলার যে অপূর্ব একটি অভিব্যক্তি আছে, পণ্ডিতমশাইর নিষ্করুণ হৃদয়কে তাহা স্পর্শও করিল না; তিনি এই ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া ইস্কুলে সকল ছাত্রদের সমক্ষে তাহার নামকরণ করিলেন 'গিন্নি' বলিয়া, এবং ছোট্ট ঘটনাটিকে সবিস্তারে লঘু রসিকতায় হালকা করিয়া তাহাকে কৌতুকে ও বিদ্রূপে লাঞ্ছিত করিলেন। যে স্নেহের লীলা আশুর কাছে ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক, এই বিদ্রূপের লাঞ্ছনায় সেই বোনের সহিত স্নেহের খেলাই জীবনের একটি সর্বপ্রধান লজ্জাজনক ভ্রম বলিয়া তাহার কাছে বোধ হইতে লাগিল। এমনই করিয়া একটি সহজ হৃদয়-বৃত্তি পীড়িত ও সংকুচিত হইল। এই ক্ষুদ্র কথাটি বলিতে গিয়া গল্পটির মধ্যে এমন একটি সকরুণ সহৃদয়তা প্রকাশ পাইয়াছে, যাহার তুলনা প্রতিদিনের বাস্তবজীবনে কমই দেখা যায়। পারিবারিক বিরোধ ও কলহ ব্যক্তিগত স্নেহ ও ভালবাসার সম্বন্ধকে কি ভাবে সংকুচিত করে, 'ব্যবধান' গল্পটিতে তাহার পরিচয় আছে। অতি সাধারণ ঘটনা, আমাদের পারিবারিক জীবনে নিয়তই এমনই ঘটিতেছে, অথচ তাহা বনমালী ও হিমাংশুমালীর পবিত্র স্নেহ ও ভালবাসার মধ্যে কি করিয়া যে একটি ব্যবধানের সৃষ্টি করিল, এবং সেই সম্বন্ধকে কুণ্ঠিত ও পীড়িত করিয়া তুলিল তাহার অত্যন্ত সহৃদয় বর্ণনা এই গল্পটিতে আছে। গল্পটির গঠন পারিপাট্যও খুব নিপুণ।

কিন্তু যে কয়টি গল্পের উল্লেখ করিলাম, তাহার মধ্যে কোন জটিলতা নাই। যে স্নেহ বা প্রীতির সম্বন্ধকে আমরা তুচ্ছ বলিয়াই বিচার করিয়া

থাকি, কবি তাঁহার সকরুণ সহৃদয়তায় আমাদের হৃদয়বৃত্তির সেই তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র প্রকাশগুলির সৌন্দর্য. তাহাদের পীড়া ও সংকোচ আমাদের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন মাত্র। এই কয়েকটি গল্প তাঁহার গল্পরচনার প্রথম অধ্যায়ে রচিত। বাঙালীর পরিবার ও সমাজ-সম্পর্ক, অথবা তাহার বিচিত্র বিধান ও আবেষ্টন এই গল্পগুলির মধ্যে কোনও আবর্তের সৃষ্টি করে নাই, হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র লীলা তখনও কোনও অতর্কিত অসামাজিক কোনও জটিলতা ঘনাইয়া তোলে নাই। কিন্তু কবির কাছে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যতই নিকটতর হইতে লাগিল, মানুষ তাহার অন্তরের গোপন প্রবাহটির বিচিত্রলীলা লইয়া যতই তাঁহার প্রিয় হইতে প্রিয়তর হইতে লাগিল, ততই তিনি দেখিতে পাইলেন, আমাদের নিয়মবদ্ধ সংকীর্ণ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের মধ্যেও মনোবৃত্তির যে লীলা তাহার বৈচিত্র্য অপরিসীম, এবং তাহার ক্ষুব্ধ জটিলতায় আমাদের অতি পরিচিত মনগুলিও পীড়িত ও উদ্বেলিত। ইহার প্রথম সরস পরিচয় পাই আমরা ১৩০০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে লেখা 'মধ্যবর্তিনী' গল্পটিতে। মানুষের হৃদয়বৃত্তির যেটি প্রবলতম, সেই প্রেম একটি সহজ পারিবারিক জীবনযাত্রাকে কি ভাবে জটিল করিয়া তুলিয়াছে, এবং তিনটি মানুষের জীবনকে কি ভাবে ক্ষুব্ধ ও উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার অপূর্ব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে, তাহার মধ্যে অপূর্ব রস ও আবেগ সঞ্চারে রবীন্দ্রনাথ যে অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি ও মনোবিশ্লেষণে ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, ইহার পূর্ববর্তী কোনও গল্পেই তাহা পাওয়া যায় না এবং পরেও খুব বেশি গল্পে পাই না। বহুদিন ভুগিয়া রোগমুক্তির পর হরসুন্দরীর মনে একটি প্রবল আনন্দ, বৃহৎ প্রেমের সঞ্চার হইল, তাহার মনে হঠাৎ একটা আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। এবং এই ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া সে এক সুবৃহৎ ত্যাগ করিয়া বসিল—পুত্রহীনা হরসুন্দরী এক রকম জোর করিয়াই

স্বামীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করাইল, এবং শুধু তাহাই নয়, নববধূ শৈলবালাকে স্বামীর কাছে সোহাগিনী করিয়া তুলিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিল। কিন্তু যেদিন সে দেখিল নিবারণ তাহাকে ছাড়িয়া একান্ত করিয়া শৈলবালাকেই লইয়া একেবারে আত্মহারা হইয়া গেল এবং সর্বনাশা প্রেমের সুগভীর গহ্বরে আত্মবিসর্জন করিল, তখন তাহার বুকের মধ্যে বেদনা যেন টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। কোথায় গেল সেই বল, যে-বলে হরসুন্দরী মনে করিয়াছিল স্বামীর জন্য চিরজীবন সে আপনার প্রেমের দাবির অর্ধেকাংশ অকাতরে ছাড়িয়া দিতে পারিবে! আর নিবারণের জীবনের নিম্নস্তরে যে একটি যৌবন-উৎস বরাবর চাপা পড়িয়াছিল, আঘাত পাইয়া হঠাৎ বড় অসময়ে তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। দুর্দমনীয় প্রেমবাসনার অত্যাচারে তাহার বুদ্ধি বিবেচনা এবং সংসারের সমস্ত বন্দোবস্ত উলট্‌ পালট্‌ হইয়া গেল, এবং অবশেষে নিদারুণ সর্বনাশের মধ্যে হঠাৎ যখন একদিন জাগিয়া উঠিল, তখন ততদিনে শৈলবালা ক্রমাগত আদর সোহাগ পাইয়া নিজের মধ্যে নিজে অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, সমস্ত সেবা, সমস্ত সম্পদ, সমস্ত সৌভাগ্য নিজের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া একান্ত আত্মসর্বস্ব হইয়া উঠিয়াছে। এ অবস্থায় অহংকার আছে কিন্তু তৃপ্তি নাই, নারী-জীবনের যথার্থ সুখের আস্বাদ নাই। এদিকে শৈলবালার ভোগের সন্তুষ্টি বিধান করিতে গিয়া নিবারণ যখন সর্বস্বান্ত হইল, তখন তাহার অসন্তোষ ও অসুখের আর শেষ নাই; দেহমনের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য হইতে সে বঞ্চিত হইল। অবশেষে 'শৈলবালা বাঁচিল না। সংসারের সমস্ত সোহাগ আদর লইয়া পরম অসুখ ও অসন্তোষে ক্ষুদ্র বালিকার অসম্পূর্ণ ব্যর্থ জীবন নষ্ট হইয়া গেল।' তাহার পর আবার নিবারণ নূতন করিয়া পুরাতন হরসুন্দরীকে ফিরিয়া পাইল বটে, কিন্তু 'ঠিক মাঝখানে একটি মৃতা বালিকা শুইয়া রহিল, তাহাকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিল না।'

গল্পটির কাঠামো যেমন করিয়া বিবৃত করিলাম তাহাতে গল্পের বিশেষ ধর্মটি হয়ত ধরা পড়িবে, কিন্তু একটি মানুষের জীবনে সজাগ প্রেমের জাগরণ তিনটি প্রাণীর সমগ্র জীবন-ধারার মধ্যে কেমন একটা ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করিয়াছে, তিনটি মন, বিশেষভাবে হরসুন্দরীর মন, কি ভাবে সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব-লীলায় আন্দোলিত হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ যে রস-সঞ্চারের ক্ষমতা, যে অপূর্ব মনোবিশ্লেষণের প্রতিভা দেখাইয়াছেন, যেমন করিয়াই গল্পটির সারাংশ উদ্ধৃত করিনা কেন, কিছুতেই তাহার মধ্যে তাহার পরিচয় মিলিবে না।

এই আশ্চর্য মনোবিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় 'সমাপ্তি' গল্পটিতেও আছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আছে অপূর্ব কাব্যসৃষ্টির সার্থক চেষ্টা। বন্য মৃগের মত দুরন্ত চঞ্চলা বালস্বভাবা মৃন্ময়ীকে যখন ধরিয়া বাঁধিয়া জোর করিয়া বিবাহ দেওয়া হইল, তখন প্রথম প্রথম অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার বন্য স্বভাব কিছুতেই পোষ মানিল না, সমস্ত দেহমন তাহার বহুদিন পর্যন্ত বিদ্রোহী এবং নিজের ঘরে প্রকৃতির মুক্ত আবেষ্টনের মধ্যে ফিরিয়া আসিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল, বালসুলভ চপলতা কিছুতেই তাহার ঘুচিল না। কিন্তু তাহার এই অদ্ভুত ব্যবহারে স্বামী অপূর্ব যখন তাহাকে বাপের বাড়ি রাখিয়া দীর্ঘ দিনের জন্য কলিকাতা চলিয়া গেল, তখন হঠাৎ কি এক অদৃশ্য প্রভাবে যেন সমস্ত আমূল পরিবর্তিত হইয়া গেল। হঠাৎ যেন তাহার মনে হইল, সমস্ত গৃহে এবং গ্রামে কেহ লোক নাই, হঠাৎ এক মুহূর্তে যেন তাহার বাল্যজীবন অপসারিত হইয়া যৌবনস্বপ্নে সমস্ত আকাশ ছাইয়া গেল, হঠাৎ যেন কেমন করিয়া বাল্য অংশ যৌবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল। বিস্মিত ব্যথিত মৃন্ময়ীর সমস্ত স্মৃতি 'সেই আর একটি বাড়ি, আর একটি ঘর, আর একটি শয্যার কাছে গুণ্‌ গুণ্‌ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।' এই অতর্কিত আমূল পরিবর্তন, এ যেন এক সোনার

কাঠির স্পর্শ, এবং এই স্পর্শটুকু এমন সুন্দর ও মনোরম করিয়া কবি ফুটাইয়াছেন যে, তাহার মধ্যে একটি অতি সুকোমল দরদ-বোধ যেন স্বতঃ উচ্ছসিত হইয়া উঠিয়াছে। 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পটিতে শশিভূষণ ও গিরিবালার মধ্যে স্নেহে সুকোমল যে একটি শুদ্ধ পবিত্র সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল, সে-সম্বন্ধের স্বরূপটি হয়ত শশিভূষণ বা গিরিবালা কাহারও যথেষ্ট স্পষ্ট করিয়া জানা ছিল না, আমাদেরও তাহা স্পষ্ট করিয়া জানিবার উপায় নাই; কিন্তু সেই সুকোমল সম্বন্ধটি এমন একটি সকরুণ বিচ্ছেদ-ব্যথার মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে যে, তাহাতে সমস্ত মন ব্যথিত হইয়া উঠে। এই গল্পটিতেও কবির অন্তর্দৃষ্টি ও মনোবিশ্লেষণের ক্ষমতা সুপরিস্ফুট; কিন্তু গল্পটিতে অবান্তর ঘটনা বাহুল্য এত বেশি, এবং সেই ঘটনাগুলিও এত খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন যে সমগ্র গল্পটি জমাট বাঁধে নাই, এক কথায়, রসঘন হইয়া উঠিতে পারে নাই। শ্রীকুমার বাবু সত্যই বলিয়াছেন, "গল্পটি শশিভূষণের জীবন-কাহিনীর কতকগুলি বিচ্ছিন্ন খণ্ডাংশের সমষ্টি বলিয়া আর্টের পরিণত ঐক্য লাভ করিতে পারে নাই।"

কিন্তু 'দিদি' গল্পটি নিখুঁত অপূর্ব—কি ইহার চরিত্র-বিশ্লেষণের ক্ষমতায় কি সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিতে, কি ঘটনাসংস্থানে, কি ইহার করুণ সমাপ্তিতে। জয়গোপালের স্ত্রী শশিমুখীর মনে স্বামী-বিরহের যখন প্রবল প্রেমাবেগ জাগিয়া উঠিতেছে, যখন 'নির্জনঘরে বিরহশয্যায় উন্মেষিত-যৌবনা নববধূর সুখস্বপ্ন' দেখিতেছে, ঠিক তখনই পিতৃমাতৃ-হারা ছোটভাইটিকে লইয়া স্বামীর সহিত তাহার এক বিরোধের সূত্রপাত হইল; এবং ভিতরে ভিতরে উভয়ে উভয়কে অহরহ আঘাত দিতে লাগিল। ছোট একটি ছিদ্র অবলম্বন করিয়া এই বিরোধ ক্রমে অত্যন্ত 'বিকট বীভৎস আকার' ধারণ করিল। শশীর মন ছোট-ভাইটিকে সকল অসুখ অবিচার হইতে রক্ষা করিতে প্রাণপণে আকুল,

অথচ স্নেহলেশহীন অবিচারী স্বার্থপরায়ণ স্বামীর প্রতি তাহার প্রেমের টানও কম নয়। মনের মধ্যে এই নীরব দ্বন্দ্বের আন্দোলনটি গল্পের মধ্যে অতি চমৎকার রূপ পাইয়াছে, এবং শশীর শান্ত নীরব সহিষ্ণুতা এই রূপটিকে আরও করুণ মাধুর্যে ভরিয়া তুলিয়াছে। 'দৃষ্টিদান' গল্পটি মিলনাত্মক, কিন্তু আরও সুন্দর, আরও মধুর; এবং প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এমন একটা স্নিগ্ধ সুকোমল সংযত প্রেমাবেগ দ্বারা উচ্ছ্বসিত এমন মৃদুসৌরভ, সংগীত, সৌন্দর্য এবং সুকুমার চিরতারুণ্য দ্বারা আপ্লুত যে, কোনও ভাষায়, কোনও কথায় তাহা ব্যক্ত করা একেবারেই অসম্ভব। প্রত্যেকটি কথায়, প্রত্যেকটি চিত্রে ও বর্ণনায় একটি পেলব সুকোমল মাধুর্য সমস্ত গল্পটিকে যেন একটি ফুলের মতন ফুটাইয়া তুলিয়াছে। অথচ তাহার মধ্যে কি সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়; কবি যেন চোখ দিয়া কিছু দেখেন নাই, মন দিয়া সমস্তই অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার অন্ধ মানসকন্যাটির সঙ্গে সঙ্গে তিনিও যেন অন্ধ হইয়া গিয়াছেন; চোখ দিয়া সমস্ত জীবন ও প্রকৃতিকে দেখিবার ও ভোগ করিবার যে সুবিধা, তাঁহার দৃষ্টিহীনা কন্যাটির জন্য যেন তিনি তাহা বিসর্জন দিয়াছেন। মনের স্বচ্ছ গভীর অনুভূতি-দৃষ্টির যে-জগতে তাঁহার কন্যাটির বাস, তিনি-ও যেন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই জগতের অধিবাসী হইয়াছেন, নহিলে বুঝি দৃষ্টিহীনার সহজ অন্তর্দৃষ্টি, সূক্ষ্ম সুগভীর অনুভূতি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবোধ এমন করিয়া কিছুতেই ফুটাইয়া তোলা সম্ভবপর হইতনা। অবস্থা স্বচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর যখন পরিবর্তন আরম্ভ হইল, ন্যায় অন্যায় ধর্ম অধর্ম সম্বন্ধে তাহার মনের বেদনাবোধ যখন অসাড় হইয়া আসিতে লাগিল, তখন সেই দৃষ্টিহীনা সহজেই সব বুঝিতে পারিল। "একদিন একজন ধনিলোকের আমলা আসিয়া তাঁহার সঙ্গে গোপনে দুইদিন ধরিয়া অনেক কথা বলিয়া গেল, কি বলিল আমি কিছুই জানিনা,—কিন্তু তাহার পরে যখন তিনি

আমার কাছে আসিলেন, অত্যন্ত প্রফুল্লতার সঙ্গে অন্য নানাবিষয়ে নানা কথা বলিলেন, তখন আমার, অন্তঃকরণের স্পর্শশক্তিদ্বারা বুঝিলাম, তিনি আজ কলঙ্ক মাখিয়া আসিয়াছেন।" তারপর হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে যখন স্বামীর নূতন প্রেমাবেগের সঞ্চার হইতেছে, তখন তাহার এই নূতন অনুভূতি দৃষ্টিহীনা স্ত্রীর নিকট হইতে তিনি প্রাণপণে গোপন করিতেছেন; কিন্তু দৃষ্টিহীনা নারী অতীন্দ্রিয় অনুভূতি দিয়া সকলই বুঝিতেছে, দেখিতেছে। "অথচ পত্রদ্বারা তিনি যে সর্বদাই তাহার (হেমাঙ্গিনীর) খবর পাইতেছেন, তাহা আমি অনায়াসে অনুভব করিতাম; যেমন পুকুরের মধ্যে বন্যার জল যখন একটু প্রবেশ করে সেই দিনই পদ্মের ডাঁটায় টান পড়ে—তেমনই তাঁহার ভিতরে একটুও যেদিন স্ফীতির সঞ্চার হয়, সেদিন আমার হৃদয়ের মূলের মধ্য হইতে আমি আপনি অনুভব করিতে পারি।" দৃষ্টিহীনার এমন অনবদ্য সহজ অথচ সূক্ষ্ম অনুভূতির এমন অপূর্ব পরিচয় সাহিত্যে খুব কমই দেখা যায়। এই গল্পটির সুকোমল মৃদু মাধুর্য 'মাল্য-দান' গল্পটিতেও আছে। কুড়ানি কুড়াইয়া পাওয়া মেয়ে, বনের হরিণশিশুর মত সরল, তাহার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির স্ফুরণও হয় নাই। একটি অপরিচিত যুবকের সম্মুখে তাহাকে লইয়া প্রেমের ও বিবাহের কত কৌতুক, অথচ কিছুই সে বুঝিতে, কিছুরই মর্ম সে গ্রহণ করিতে পারেনা। কিন্তু, একদিন সেই স্বল্পপরিচিত যুবকটি যখন চলিয়া গেল, তখন বাহিরে রৌদ্ররচিত জগৎখণ্ডের প্রাণের আনন্দের মধ্যে, "ঐ বুদ্ধিহীনা বালিকা তাহার জীবনের, তাহার চারিদিকের, সংগত কোন অর্থ বুঝিয়া উঠিতে পারিলনা। সমস্তই কঠিন প্রহেলিকা! কি হইল, কেন এমন হইল, তা'র পরে এই প্রভাত, এই গৃহ, এই যাহা কিছু সমস্তই এমন একেবারে শূন্য হইয়া গেল কেন? যাহার বুঝিবার সামর্থ্য অল্প, তাহাকে হঠাৎ একদিন

নিজ হৃদয়ের এই অতল বেদনার রহস্যগর্ভে কোনো প্রদীপ হাতে না দিয়া কে নামাইয়া দিল? জগতের এই সহজ উচ্ছ্বসিত প্রাণের রাজ্যে, এই গাছপালা মৃগপক্ষীর আত্মবিস্মৃত কলরবের মধ্যে কে তাহাকে আবার টানিয়া তুলিতে পারিবে?" তারপর দেখিতে না দেখিতে মৃগশিশু কুড়ানি কখন হৃদয়ভারাতুরা যুবতী নারী হইয়া উঠিল! "কোন্ রৌদ্রের আলোকে—কোন্ রৌদ্রের উত্তাপে তাহার বুদ্ধির উপরকার সমস্ত কুয়াশা কাটিয়া গিয়া তাহার লজ্জা, তাহার শঙ্কা, তাহার বেদনা এমন হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়িল!" এবং সর্বশেষে আরও দুঃখ বেদনার ভিতর দিয়া একটা ব্যর্থ সার্থকতার মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করিল। কুড়ানির ও যতীনের মনোবৃত্তি স্ফুরণের যে-চিত্র এই গল্পটিতে আছে তাহার মধ্যে কবির সহজ ও স্বাভাবিক সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির ও ভাষার গীতময়তার পরিচয় অতি চমৎকার প্রকাশ পাইয়াছে।

'মাস্টার মশায়' গল্পটি অত্যন্ত সরল; গৃহশিক্ষকের সঙ্গে তাহার ছাত্রের স্নেহসম্পর্কের একটি কাহিনী। অথচ, এই অতিপরিচিত মনোবৃত্তিটি তাহার সহজ ও স্বাভাবিক বিকাশের পথ না পাইয়া নিজের মধ্যে পীড়িত ও সংকুচিত হইয়া মরিয়াছে। মাতৃহারা বেণুগোপাল তাহার পিতার ক্রমবর্ধমান অবহেলা ও ঔদাসীন্যের হাত হইতে মুক্তি পাইতে গিয়া সর্বনাশ করিয়া বসিল তাহার, যে তাহাকে সকলের চাইতে বেশি স্নেহ করে। অথচ এই সর্বনাশ যে মাস্টারমশাই হরলালের সর্বনাশ তাহা সে বুঝিল না। তাহার একান্ত স্নেহের পাত্রই যে তাহাকে অন্ধকার গহ্বরে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে, একথা ত সে কাহাকেও বলিতে পারেনা, মা-কেও না; আর মুখ ফুটিয়া বলিতে কি, ভাবিতে গেলেও যে তাহার দেহমন সমস্ত অসাড় অবসন্ন হইয়া আসে, অথচ অন্তদিকে লজ্জা, অপমান, দুঃখ কাল ঘন মেঘের মত যেন তাহার সমস্ত জীবনকে ঘেরিয়া আসিয়াছে, মুক্তির কোনও পথ নাই,

সহায় নাই, নিষ্কৃতি নাই। ভাবিতে ভাবিতে স্বাভাবিক বুদ্ধি যখন লয় পাইল, মস্তিষ্কে যখন বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিল, সমস্ত জীবন যখন দুর্বহ হইয়া একটা চঞ্চল বিক্ষোভের মধ্যে তাহার অবসান খুঁজিতে লাগিল, তখন জীবনের এই তুচ্ছেন্ত জটিল ট্র্যাজেডিটুকু একটা অদ্ভুত ভঙ্গি অবলম্বন করিয়া একটি শান্ত অচঞ্চল সুগভীর অনুভূতির মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করিল। এই বিশেষ ভঙ্গিটুকুর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের কল্পমায়ার, তাহার বিশেষ কবি-মানসের অপূর্ব পরিচয় আছে। ব্যাপারটি কিছুই নয়; এই সহায়সম্বলহীন নৈরাশ্যান্ধকারময় বর্তমান ও ভীষণতর ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার দেহমনের চৈতন্য বিলুপ্ত হইল; এবং এই প্রকাণ্ড মানসিক আঘাত সহ্য করিয়া সে আর বাঁচিয়া উঠিতে পারিল না। কবির হাতে যখন এই প্রবল মানসিক বিক্ষোভ ক্রমে অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, ট্র্যাজেডি যখন প্রায় চরমে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন এক অপূর্ব কৌশলের ফলে সমস্ত ট্র্যাজেডিটুকু যেন একটি সোনার কাঠির ছোঁয়ায় এক অপরূপ রূপে মণ্ডিত হইয়া একটি পরিপূর্ণ ভাবলোকের মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করিল। "সমস্ত বেদনা যেন দূর হইয়া গেল···মনের মধ্যে একটি সুগভীর সুনিবিড় আনন্দপূর্ণ শান্তি ঘনাইয়া আসিতে লাগিল।···সে যে মনে করিয়াছিল কোথাও তাহার কোনো পথ নাই, সহায় নাই, নিষ্কৃতি নাই, তাহার অপমানের শেষ নাই, দুঃখের অবধি নাই, সে কথাটা যেন একমুহূর্তেই মিথ্যা হইয়া গেল।···মুক্তি অনন্ত আকাশ পূর্ণ করিয়া আছে, শান্তির কোথাও সীমা নাই।···যে আতঙ্কে সে আপনাকে আপনি বাঁধিয়াছিল, তাহা সমস্তই খুলিয়া গেল।··· বাতাস ভরিয়া গেল, আকাশ ভরিয়া উঠিল, একটি একটি করিয়া নক্ষত্র মিলাইয়া গেল,—হরলালের শরীর মনের সমস্ত বেদনা, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত চেতনা তাহার মধ্যে অল্প অল্প করিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল,—ঐ

গেল তপ্ত বাষ্পের বুদ্‌বুদ একেবারে ফাটিয়া গেল,—এখন আর অন্ধকারও নাই, আলোকও নাই, রহিল কেবল একটি প্রগাঢ় পরিপূর্ণতা।" ইহাতে যে শুধু সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের সঙ্গে একটি অপূর্ব কল্পনায়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাই নয়; সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে প্রকৃতির ভাষায় রূপান্তরিত করিবার, প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের সঙ্গে তাঁহাকে একান্তভাবে যুক্ত করিয়া অভিব্যক্তি দান করিবার যে বিশেষ শিল্পকৌশল একান্তই রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য, এই গল্পটির পরিসমাপ্তির মধ্যে তাহারও পরিচয় আছে। অথচ আমি আগেই বলিয়াছি, এই শিল্পকৌশল কিছু সজ্ঞান চেষ্টা নয়, ইহা তাঁহার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির, বিশেষ অনুভূতিরই একটি প্রকাশ; সৃষ্টির মর্মস্থলে একটি বিরাট ঐক্যানুভূতির অভিব্যক্তি।

'রাসমণির ছেলে' গল্পটি প্রকৃতপক্ষে দুইটি গল্প। কালীপদর যে বাল্যজীবন সুদৃঢ় সুকঠোর মাতৃশাসন ও উদার শিথিল পিতৃস্নেহের মধ্যে কাটিয়াছে, সেই বাল্যজীবনের পরিচয়টুকু সম্পূর্ণ করিতে গিয়া ছোট একটি গল্পের অবতারণা করিতে হইয়াছে। তাহার মধ্যে পতি-প্রেম ও মাতৃস্নেহ তাহার সমস্ত স্নিগ্ধ কোমল মাধুর্য ও সুকঠোর দৃঢ়তা লইয়া কি করিয়া অপূর্ব রূপে ফুটিয়া উঠিল, একটি বালকের সুকোমল হৃদয় পিতৃহৃদয়ের শিথিল উদার স্নেহের মধ্যে দায়িত্বলেশহীন সুখপরায়ণ যথেচ্ছাচারী হইয়া গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনার মুখে মাতার সুদৃঢ় শাসনে কি করিয়া সংযত হইয়া গেল, এবং কি করিয়া মাতার একান্ত অন্তরঙ্গ হইয়া ক্রমে সে বুঝিল যে পৃথিবীতে মূল্য না দিয়া কিছুই পাওয়া যায় না, এবং সে মূল্য দুঃখের মূল্য, এই ছোট খণ্ড-গল্পটির মধ্যেই তাহার সমস্ত পরিচয় আছে। একটু বিকৃত ভাষায় বলিতে গেলে, ইহা একটি গল্পের ভিতর আর একটি গল্প। সত্য বলিতে কি, ইহার পরে রাসমণি চরিত্রের নূতন পরিচয় আর কিছু পাই না;

শুধু পরিচয় বলিয়াই নয়, তাঁহার দেখাও আর পাই না, যতটুকু পাই তাহা কালীপদর মধ্যেই ; এবং কালীপদর যে পরিচয় ইহার পরে আছে, তাহারও সূচনা এই খানেই আমরা পাইলাম। এই গল্পাংশটির সঙ্গে পরবর্তী অংশটির খুব একটা নিবিড় ঐক্য কিছু নাই, শুধু ঐ ভবানীচরণের বিগত বংশাভিমান ও উইল চুরির ব্যাপারটি ছাড়া। যাহা হউক, লেখাপড়া শিখাইয়া ছেলেকে মানুষ করিবার জন্য রাসমণি ছেলেকে কলিকাতা পাঠাইলেন, মাতার আশীর্বাদ কালীপদকে রক্ষাকবচের মত ঘিরিয়া রহিল। রাসমণি এইখানেই বিদায় লইলেন। ইহার পরবর্তী গল্পাংশে রাসমণির স্থান কোথাও নাই। কিন্তু ভবানীচরণ যে নিজের কোল ছাড়িয়া কালীপদকে কলিকাতা পাঠাইতে রাজী হইলেন, তাহা কালীপদকে 'মানুষ করিবার জন্য নয় ; তিনি ভাবিলেন কালীপদ লেখাপড়া শিখিয়া উইল চুরির প্রতিশোধ লইবে, সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আনিবে, এবং বিলুপ্ত বংশ গৌরবকে ফিরাইয়া আনিবে। কালীপদ মাতার আশীর্বাদের বর্মে নিজেকে আবৃত করিয়া কলিকাতায় জীবন কাটাইতে লাগিল ; তারপর একদিন যখন সেই বর্মে আঘাত লাগিল, তাহার মাতৃআশীর্বাদের উপর যখন লাঞ্ছনা বর্ষিত হইতে আরম্ভ করিল, তখন সে ভাঙ্গিয়া পড়িল, তবু আত্মার পরাভব কিছুতেই স্বীকার করিল না, নিজের দুঃখের স্বাতন্ত্র্যকে কিছুতেই অপমানিত হইতে দিল না। মায়ের আশীর্বাদ অক্ষয় হইয়া রহিল, কিন্তু কালীপদ বাঁচিল না। কিন্তু বীর সৈনিকের মত মাতার আশীর্বাদের পতাকা বহন করিবার উজ্জ্বল সাধনার মধ্যে এই গল্পাংশটির সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠে নাই ; সে সৌন্দর্য ফুটিয়াছে শৈলেন্দ্রের চরিত্রের বিশ্লেষণে, এবং ভবানীচরণের জীবনের ট্র্যাজেডির মধ্যে। প্রথমটায় শৈলেন অর্থ ও আভিজাত্যের গর্বে কালীপদকে অবজ্ঞা করিয়াই চলিত, লজ্জিত ও অপদস্থ করিতেও

সংকুচিত হইত না; তারপর একদিন সে বিদ্রূপ ও লাঞ্ছনা যখন চরমে উঠিল, এবং কালীপদ যখন বেদনায় ভাঙিয়া পড়িল, তখন শৈলেনের ব্যবহারের এক অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিল; এবং তখন পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে সে কোনও কিছুই বাকি রাখিল না। এই পরিবর্তনের মধ্যে, এবং শৈলেনের পূর্বকার চরিত্র-চিত্রণের মধ্যে অপূর্ব মনো-বিশ্লেষণের পরিচয় আছে, এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া কালীপদর চরিত্রে যে দৃঢ়তা ও সংযম এবং একান্ত নিষ্ঠা যে ভাবে ও ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে তাহারও নৈপুণ্য কম নয়। কালীপদ মরিল; স্বামীর কথা ভাবিয়া 'রাসমণি নিজের শোককে ভাল করিয়া প্রকাশ করিবার আর অবসর পাইলেন না, তাঁহার পুত্র আবার তাঁহার স্বামীর মধ্যে গিয়া বিলীন হইল।' কিন্তু ট্র্যাজেডি ঘনীভূত হইয়া উঠিল ভবানীচরণের জীবনে। কালীপদ কলিকাতা গিয়াছিল 'সীতা উদ্ধার' করিতে, ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে ফিরাইতে; ভবানীচরণ এই ভরসা নিয়া বাঁচিয়াছিলেন। কিন্তু কালীপদ যখন মরিল, তখন আর কিছুই আশা করিবার, আকাঙ্ক্ষা করিবার রহিল না, রহিল কেবল পিতৃহৃদয়ের দুঃখ ও ব্যথা। এমন সময় এক নিশীথ রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে বন্দিনী সীতার উদ্ধার হইল, উইল পাওয়া গেল, ঘরের লক্ষ্মী ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তখন কালীপদ নাই—উইলের কি প্রয়োজন, ঘরে লক্ষ্মী থাকিল কি না-ই থাকিল, তাহাতেই বা কি ক্ষতি!

কিন্তু এম্‌নি করিয়া কয়টি গল্পের উল্লেখ করা সম্ভব? আমি কয়েকটি প্রধান প্রধান গল্পের উল্লেখ করিলাম মাত্র। আমাদের হৃদয়-বৃত্তির বিচিত্র লীলার মধ্যে পরিবার ও সমাজের সরল ও জটিল আবেষ্টনে, তাহার বিচিত্র পরিচয়ের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও সহজ অনুভূতি অবাধ বিহারের আনন্দলাভ করিয়াছে, নিজের সুকোমল দরদবোধ দিয়া আমাদের হৃদয়বৃত্তির সেই সূক্ষ্ম জটিল

লীলাগুলিকে তিনি বিশ্লেষণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার এই সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও মনোবিশ্লেষণ অপূর্ব রসে ও সৌন্দর্যে এই গল্পগুলির মধ্যে সর্বত্র অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। 'ঠাকুর্দা' গল্পে ঠাকুর্দার চরিত্রে, 'পণরক্ষা' গল্পে বংশীবদন ও রসিকের জটিল স্নেহ সম্পর্কের মধ্যে, 'হালদার গোষ্ঠী' গল্পে পরিবারের দাবির সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রেমের দাবির বিরোধ ও অসংগতিতে বনোয়ারিলাল ও কিরণলেখার যে পরিচয় আছে তাহার মধ্যে, 'হৈমন্তী' গল্পে হৈমন্তীর চরিত্রে যে শান্ত সুগম্ভীর সহিষ্ণুতা একটা দুঃখের মূর্তি ধারণ করিয়াছে, তাহার মধ্যে, এবং এমনই ধরনের আরও অনেক গল্পেই কবি হৃদয়ের এই সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, সহজ ও দরদবোধ ও অপূর্ব মনোবিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায়।

একথা আজ সর্বজনবিদিত যে ছোটগল্প রচনার যখন সূত্রপাত তখন রবীন্দ্রনাথ বৈষয়িক কর্মোপলক্ষে পদ্মার সুবিস্তীর্ণ সুপ্রসারিত বুকের উপর অথবা পদ্মারই শীর্ণ শাখানদীর উপর বোটে করিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। "ছিন্নপত্রে" বারবার তাহার প্রমাণ মিলিবে। এক একদিন এক এক বস্তু পরিবেশ ও মানসমণ্ডলের মধ্যে এক একটি গল্প কি করিয়া রূপ লইতেছে, "ছিন্নপত্রে", অন্যান্য চিঠি-পত্রে এবং নিবন্ধে তাহা ধরা পড়ে। বজরার ছাতের উপর বসিয়া অথবা তাহার জানালার ভিতর দিয়া তিনি নদীর দুই তীরের বিচিত্র জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; টুক্‌রো বিচ্ছিন্ন এক একটি অংশ জীবনের, অথচ সেই খণ্ডিত অংশই চলমান পল্লীজীবন স্রোতের প্রেক্ষাপটে একটি অখণ্ড সম্পূর্ণরূপে ধরা দিয়াছে। সেই জীবন-স্রোতের মধ্যে তিনি ঝাঁপাইয়া পড়েন নাই, নিজেকে জলস্রোত-ধৃত জন ও জীবন স্রোতের মধ্যে ভাসাইয়া দেন নাই, বরং নদীর মতই নিরাসক্ত ভাবে সেই জীবনস্রোতের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া, তাহার দুই তীর ছুঁইয়া ছুঁইয়া ভাসিয়া চলিয়া গিয়াছেন; এক

মুহূর্তে তীর এবং তীরের মানুষ তাঁহার একান্ত আপন হইয়াছে, তাহাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে তিনি নিবিড়ভাবে নিজেকে জড়াইয়াছেন, পর মুহূর্তেই তাহাদের নির্দয়ভাবে ছাড়িয়া চলিয়াও গিয়াছেন—'পোস্টমাস্টার', 'অতিথি' প্রভৃতি গল্পেই ত তাহার প্রমাণ! এই যে জলস্রোতের উপর বসিয়া জন ও জীবনস্রোত দেখা, এই দেখার রহস্যই আদিপর্বে রবীন্দ্র-ছোটগল্পের রহস্য। একদিকে পরম আত্মীয়তা পরম অন্তরঙ্গতা, লোকালয়ের জীবনযাত্রার সঙ্গে একান্ত সুনিবিড় ঘনিষ্ঠতা ও ভালবাসা, আর একদিকে জলস্রোতের মতই পরম নির্লিপ্ত নির্বিকার ঔদাসীন্য। একদিন কবি অতি তুচ্ছ ঘটনাকেও নিবিড় আলিঙ্গনে বুকে জড়াইয়া ধরেন, আর একদিন এক বৃহৎ প্রেম বৃহৎ ঘটনাকেও নিষ্ঠুরভাবে অবজ্ঞা করিয়া চলিয়া যান। নিত্য পরিবর্তনশীল পদ্মাতীরের জীবনস্রোত ও নিত্যপরিবর্তনশীল পদ্মার জলস্রোত এই দুইয়ে মিলিয়া কবির কল্পনাকে দ্রুত উদ্দীপ্ত করিয়াছে।

পূর্ববাংলার পদ্মার বুকে বসিয়া মানস চক্ষে বাংলার যে-রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাই বাংলা দেশের বিশিষ্ট ও সমগ্র রূপ। বাংলা দেশের যে বিশিষ্ট প্রাকৃতিক রূপ, গ্রীষ্মে বর্ষায় শরতে শীতে, বিশেষভাবে বর্ষায় বাংলাদেশ যে রূপ পরিগ্রহ করে সে-রূপ ত এই ছোটগল্পগুলির মধ্যেই আমরা প্রথম দেখিলাম। তাঁহার আগে কোনও সাহিত্যিক রচনাতেই সে-রূপ আমরা দেখি নাই। এই বৃহৎ ব্যঞ্জনাময় গভীর রূপের বর্ণনা গল্পগুলিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। পরবর্তী জীবনে বাংলার আর এক রূপ—নিঃস্ব, গৈরিক, রুদ্র, বিরাগী রূপ—তিনি দেখিয়াছিলেন রাঢ় দেশের বিস্তীর্ণ গৈরিক প্রান্তরে, তাহার ঢেউ খেলান খোয়াই'র মধ্যে। কিন্তু ছোট গল্পে বাংলার সেই রূপ বিবৃত হয় নাই, হইয়াছে উত্তর কালের কবিতায়।

শুধু প্রাকৃতিক রূপের কথাই বা বলি কেন, বাংলাদেশ ও বাঙালীর

অন্তরের, তাহার সমাজ ও রাষ্ট্রপ্রকৃতির রূপও প্রথম আমরা দেখিলাম রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলিতেই। নগর ও পল্লীবাসী মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনমানবের পরিচয় এই গল্পগুলিতেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল। যে সমবেদনা ও সহানুভূতি না থাকিলে দৃষ্টি স্বচ্ছ উদারতা লাভ করে না কিংবা উন্মুক্তই হয় না, সেই সমবেদনা ও সহানুভূতিরই অভাব ছিল রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা-সাহিত্যে; তাহা ছাড়া এই দিককার সুবৃহৎ বাংলা-দেশ ত অনাবিষ্কৃতই ছিল। রবীন্দ্র-ছোটগল্পে যে মানুষগুলির সঙ্গে আমরা সর্বপ্রথম পরিচিত হইলাম, হয়ত তাহাদের চারিদিকে ভাবাতি-শয্যের একটু অস্পষ্ট মায়াজাল বিস্তৃত আছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহারা যে একান্তই বাঙালী, একান্তই আমাদের আত্মীয় আমাদের প্রতিবেশী এটুকু চিনিয়া লইতে এতটুকু দেরি হয় না। তাহাদের সত্য ও সার্থকরূপ এই ত প্রথম ধরা পড়িল। আমাদের সামাজিক দ্বন্দ্ব ও অসংগতি, রাষ্ট্রীয় বিক্ষোভ ও আত্মসম্মানবোধের বিকাশ, আমাদের শক্তি ও দুর্বলতা, দুঃখ ও ঐশ্বর্য, সব জড়াইয়া সব কিছুকে লইয়াই আমাদের জীবন; সেই জীবনস্রোতের উপরই অগণিত চরিত্রগুলির দৈনন্দিন লীলা। তাহার প্রেক্ষাপটে আমরা যখন পোস্টমাস্টার, রামসুন্দর, নিরুপমা, রামকানাই, শশিভূষণ, রাধামুকুন্দ, তারাপদ, হিমাংশু, বনমালী, গিরিবালা, চমুরা, ছিদাম, দুখিরাম, ঈশান, কৈলাসচন্দ্র, বৈদ্যনাথ, মোক্ষদাসুন্দরী প্রভৃতিদের দেখি তখন মনে হয়, ইহারা ত আমাদেরই ঘরের লোক, অথচ ইহাদের পরিচয় এতকাল জানিতাম না। বস্তুত এক এক সময় মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এই গল্পগুলি না লিখিলে বাংলা-দেশ বুঝি আমাদের কাছে অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইত! কিন্তু একথা সত্য হউক বা না হউক, এই গল্পগুলির মধ্যে কবিচিত্তের যে গভীর ভালবাসা, যে সহানুভূতিময় দৃষ্টি বাংলাদেশের সূক্ষ্ম গভীর ঘনিষ্ঠ ও সমগ্ররূপ পাঠকচিত্তের নিকটতর করিয়াছে, যে মধ্যবিত্ত ও পল্লীবাসী

দরিদ্র বাঙালী সমাজ-মানসকে বিকশিত ও প্রস্ফুটিত করিয়াছে রবীন্দ্রপূর্ব বাংলাসাহিত্যে তাহার তুলনা নাই, এক মধ্যযুগীয় পল্লীগীতিগুলি ছাড়া।

একথা আমি অন্যত্র বলিয়াছি যে, রবীন্দ্রনাথের জন্ম যদিও অভিজাত পরিবারে, কৈশোর ও যৌবন কাটিয়াছে আভিজাত্য ও সম্পদের আবেষ্টনের মধ্যে, তাহা হইলেও তাঁহার মনন-কল্পনা আশ্রয় করিয়াছে বাংলাদেশেরমধ্যবিত্ত সমাজকে। সুতরাং আশ্চর্য হইবার কারণ নাই যে, ছোট গল্পগুলিতে যাহাদের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-বেদনার ইতিহাস রূপায়িত হইয়াছে, তাহারা কেহই আভিজাত্য ও অর্থসমৃদ্ধির দিক হইতেতাঁহার নিজের শ্রেণীভুক্ত নয়। অথচ রবীন্দ্রনাথ কোনও-দিনই সজ্ঞানে কিছু শ্রেণীবোধমুক্ত ছিলেন না; তাহারপ্রয়োজনও হয়ত তিনি বোধ করেন নাই। কারণ, শ্রেণী, সমাজ, ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতি মানব-রচিত সীমার বাহিরে নিজকে রাখিয়া মানুষকে দেখিবার মতন স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি তাঁহারবরাবরই ছিল। যখন যাহাদের কথা তিনি বলিয়াছেন—সে নয়ানজোড়ের জমিদার কৈলাসচন্দ্রই হউক, অথবা দুখিরামই হউক, অথবা উলাপুরের পোস্টমাস্টারই হউক—তখন নিছক মানুষ হিসাবেই তাহাকে দেখিয়াছেন তাহার বিশিষ্ট স্বাভাবিক আবেষ্টনের মধ্যে রাখিয়া; নিজের শ্রেণী, বর্ণ, ধর্ম কোনও কিছুর চেতনাই তাঁহার দৃষ্টিকে আচ্ছন্নকরে নাই। এই স্বচ্ছ মুক্ত দৃষ্টিই রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলিকে এমন গভীর কাব্যময় অথচ বাস্তবরূপ দান করিয়াছে।

তবে একথাও সত্য যে আদিপর্বের রবীন্দ্র-ছোটগল্পগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে একান্তভাবে ব্যক্তিগত জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই। লেখক একান্ত ভাবেই চেষ্টা করিয়াছেন শুধু আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে, আমাদের বুদ্ধি ও সমাজচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিতে ততটা নয়। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র বাঙালীর দুঃখ ও দৈন্য, লাঞ্ছনা ও অপমান, অত্যাচার ও

অবিচার, অন্যায় ও অসংগতি উদ্‌ঘাটিত করিয়া বারবারই তিনি তাহাদের সত্য পরিচয় আমাদের চিত্তের নিকটতর করিয়াছেন, কিন্তু এই সবের পশ্চাতে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার যে কি নির্মম নিষ্ঠুর অথচ অচেতন অবিচার থাকিতে পারে সে-সম্বন্ধে আমাদের কোনও ইঙ্গিত তিনি দান করেন নাই। সাম্প্রতিক বোধ ও বুদ্ধি আশা করে লেখকের নিকট হইতে এ দায়িত্বের স্বীকৃতি। গল্পগুলির মধ্যে অনেক জায়গায় লেখক নিয়তি কিংবা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে কঠোর ও জ্বলন্ত প্রতিবাদ বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন সবল লেখনীতে, কিন্তু একথাও সত্য, এসমস্তই অধিকাংশ জায়গায় ব্যক্তিগত দুঃখ ও অভিযোগকে কেন্দ্র করিয়া; বৃহত্তর সমাজগত দুঃখ ও অভিযোগের ইঙ্গিত তাহারা বহন করে না। আদিপর্বের গল্পগুলিতে এই পরিচয় অনুপস্থিত; তাহা পাওয়া যাইবে 'নষ্টনীড়' হইতে আরম্ভ করিয়া গল্পাবলীর দ্বিতীয় পর্বে।

(৪)

হৃদয়-বৃত্তির যে-লীলাবৈচিত্র্যের কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি, এই কোনও সীমা নাই, শেষ নাই। এ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের যে ছোটগল্পগুলির আলোচনা করিয়াছি তাহার সবগুলির মধ্যেই হৃদয়বৃত্তির যে লীলাবৈচিত্র্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা আমাদের কাছে অল্পবিস্তর পরিচিত, তাহাদের উদ্ভব আমাদের জীবনের মর্মস্থল হইতে, এবং পাঠকের কাছে তাহাদের আবেদন হৃদয়ের সুগভীর ভাবানুভূতির মধ্যে, তাহাদের চিত্তের সহজ দরদবোধের মধ্যে। 'পোস্টমাস্টার' কিংবা 'সমাপ্তি' কিংবা এই ধরনের যত গল্প, এই গল্পগুলি পড়িতে পড়িতে আমাদের সুগভীর হৃদয়-দেশটি যেন রসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, হৃদয়ের ডাঁটায় যেন টান পড়ে, সমগ্র মর্মস্থলটি যেন

কাঁপিয়া নড়িয়া উঠে। ইহাদের আবেদন অত্যন্ত স্বচ্ছ, সহজ, সরল। সমস্ত ঘটনা ও সমস্যাকে অতিক্রম করিয়া ইহারা সরাসরি অন্তরের গহন দেশে গিয়া ঢুকিয়া পড়ে। কিন্তু আমাদের পরিবারের ও সমাজের এই চিরপরিচিত জীবনধারার মধ্যেও হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্ম বিচিত্র-লীলা এক এক সময় এমন এক একটি অপরূপ উপায়ে বিকশিত হইয়া উঠে, এমন এক একটি অপ্রত্যাশিত পরিণতি লাভ করে যেগুলিকে সামাজিক ও পারিবারিক বিধিবিধান অনুসারে অন্যায় হয়ত বলিতে পারি, কেহ কেহ হয়ত অধর্মও বলিবেন, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুতেই বলিতে পারিনা। আমাদের অন্তরের ভাবানুভূতির মধ্যে তাহাদের আবেদন সহজ ও সরল নয়, স্বচ্ছ নয়, হয়ত তাহারা আমাদের চিত্তকে রসে ভরিয়া দেয় না, মর্মস্থলটিকে নাড়া দেয় না, কিন্তু আমাদের বুদ্ধির মধ্যে চিন্তার মধ্যে তাহারা জোর করিয়া আসন পাতিয়া বসে, সেখানে কিছুতেই তাহাদের দাবি অস্বীকার করিতে পারি না। চারিদিক বিচার বিবেচনা করিয়া দেখিলে, অন্তরের সূক্ষ্ম অলিগলি-গুলির সন্ধান লইলে সেগুলিকে একান্ত স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়; এবং আমাদের বুদ্ধি ও চিন্তাবৃত্তি তাহাতে পরিতৃপ্তি লাভ করে। হৃদয়বৃত্তির এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লীলাগুলির সম্বন্ধে বহুদিন আমরা কিছু সচেতন ছিলাম না, রবীন্দ্রনাথও হয়ত ছিলেন না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আমাদের কিংবা লেখকের চেতনাবোধ থাকিলেও অন্যায় বোধে অসামাজিক বোধে সেখানে আত্মপীড়ন ও সংকুচনের সীমা ছিল না। আজ হৃদয়বৃত্তির এই অজ্ঞাত ও অনাদৃত লীলাগুলি সম্বন্ধে আমরা কমবেশি সচেতন হইয়াছি, আমাদের বুদ্ধি দিয়া, চিন্তা দিয়া সেগুলিকে আমরা নূতন করিয়া আবিষ্কার করিতেছি, এবং অন্যায় বলিয়া মনে করিলেও কিছুতেই তাহাকে অস্বীকার করিতে পারিতেছি না। বর্তমান বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পে ও উপন্যাসে হৃদয়বৃত্তির এই নূতন আবিষ্কৃত

লীলা-জগত খুব বড় একটা স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে; কিন্তু তাহাতে বুদ্ধির লীলা ও সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ প্রতিভাই একান্তভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, অন্তরের সুগভীর ভাবরসে সর্বত্র তাহা অভিষিক্ত হয় নাই, বস্তুর যথার্থ রূপে ও পরিচয়ে তাহা আশ্রিত নয়, হৃদয়ের সহজ দরদ-বোধ তাহাকে সর্বদা আবেগে ও সৌন্দর্যে পরিপ্লুত করিতে পারে নাই। সেইজন্যই এই ধরনের গল্পে যুক্তির প্রাখর্য, বর্ণনার চাতুর্য যতটা প্রকাশ পাইতেছে, রসের গভীরতা, সহজ সৌন্দর্যানুভূতির পরিচয় ততটা পাওয়া যাইতেছে না। বর্তমান বাংলা কথা-সাহিত্যের এই নূতন অধ্যায়ের সূচনা রবীন্দ্রনাথের একশ্রেণীর ছোটগল্প ও উপন্যাসের মধ্যেই সর্বপ্রথম দেখা যায়, এবং এই গল্পগুলি সাধারণত পরবর্তী কালের রচনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাংলা কথা-সাহিত্যের এই নবধর্মের অগ্রদূত হইলেও শুধু মাত্র বুদ্ধির দীপ্তিতেই তাঁহার এই ধরনের গল্পগুলি আলোকিত হয় নাই, যুক্তির প্রাখর্য ও বর্ণনার চাতুর্যই তাহার মধ্যে কখনও একান্ত হইয়া উঠে নাই; বুদ্ধির দীপ্তির সঙ্গে মিশিয়াছে হৃদয়ের সহজ দরদবোধ, যুক্তিরই প্রাখর্যের সঙ্গে অন্তরের সুগভীর রসানুভূতি, সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের সঙ্গে সহজ সৌন্দর্যবোধ, বর্ণনা-চাতুর্যের সঙ্গে অপূর্ব কলা কৌশল, বাস্তব সত্যের সঙ্গে ভাবলোকের সত্য ও সৌন্দর্য।

যাহা হউক, এই ধরনের গল্পগুলির প্রথম পরিচয় 'নষ্টনীড়', ১৩০৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে লেখা। এই গল্পটি হইতেই রবীন্দ্র-ছোটগল্পেও দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত। 'নষ্টনীড়'কে ছোটগল্প বলিতে কাহারও কাহারও আপত্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু ঘটনার যে স্তর পর্যায়, যে আবর্ত, যে সংক্ষুব্ধ সুগভীর ঘাত-প্রতিঘাত উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য, তাহার পরিচয় 'নষ্টনীড়' গল্পে নাই। কাজেই আয়তনে প্রায় ঔপন্যাসিক সম্ভাবনা সত্ত্বেও 'নষ্টনীড়'কে ছোট গল্প পর্যায়ে উল্লেখ করাই সংগত।

যাহাই হউক, এই গল্পটিতে মনস্তত্ত্বমূলক একটি সমস্যা অতি সুনিপুণ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

চারুবালা ভূপতির স্ত্রী, অমল চারুর সমবয়সী দেবর। ভূপতি সংবাদ-পত্র সম্পাদনায় ব্যস্ত, নিরবসর কাজের লোক। স্ত্রীর দিকে চাহিবার অবসর তাহার ছিলনা, স্ত্রীর ভালবাসা যে মূল্য দিয়া কিনিতে হয়, একথা তাহার মনে কখনও জাগে নাই। তাহার একটা সাধারণ সংস্কার ছিল স্ত্রীর উপর অধিকার কাহাকেও অর্জন করিতে হয় না, 'স্ত্রী ধ্রুবতারার মত নিজের আলো নিজেই জ্বালাইয়া রাখে,—হাওয়ায় নেবেনা, তেলের অপেক্ষা রাখে না।' এই সংস্কারের উপর নির্ভর করিয়া ভূপতি কর্মসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সংসারে চারুকে সঙ্গদান করিবার জন্য রহিল অমল এবং চারুর এক ভাজ, মন্দাকিনী। মন্দাকিনীর রুচি এবং প্রবৃত্তি একটু স্থূল, বুদ্ধি একান্তই সাংসারিক। অমল সৌখীন তরুণ, কল্পনা-প্রবণ এবং সাহিত্যে যশোলিপ্সু। চারু তাহার নিরবচ্ছিন্ন অবসর অমলের আবদার দিয়া, অমলের সাহিত্য লিপ্সার গাছে জল ঢালিয়া এবং বাতাস দিয়া, এবং নানাপ্রকারে অমলের সঙ্গ আহরণ করিয়া ভরিয়া তোলে। এইভাবে চারু এবং অমলের মধ্যে একটা মধুর সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিল; তাহারও বেশি, অমলের সঙ্গ উপলক্ষ করিয়া চারুর যৌবন বিকশিত হইয়া উঠিল। 'চারু ও অমলের সখিত্বে ভূপতি আনন্দ বোধ করিত। এই দুই জনের আড়ি ও ভাব, খেলা ও মন্ত্রণা তাহার কাছে সুমিষ্ট কৌতুকাবহ ছিল।' 'কিন্তু ক্রমশ অমলের সাহিত্য যশোলিপ্সার গাছে ফুল ফুটিল, এবং তাহার সৌরভ চারু এবং অমল এই দুইজনের জগৎ অতিক্রম করিল। অমল চারুকে অতিক্রম করিল; আগে তাহার প্রতিষ্ঠা ছিল শুধু চারুর কাছে, এখন সে দশজনের প্রতিষ্ঠার মধ্যে দাঁড়াইয়া শতজনের প্রতিষ্ঠার দাবি করিল। চারু তাহাতে ব্যথিত হইল, অমল যে ক্রমশ তাহার

নীড় হইতে বাহির হইয়া ডানা মেলিতেছে, ইহাতে তাহার নবজাগ্রত নারীত্বে সে আঘাত পাইল। মন্দাকিনী এতদিন অমলকে বিশেষ একটা কেহ বলিয়া মনে করে নাই। আজ তাহার স্থূল রুচি ও প্রবৃত্তি লইয়া 'মন্দা যখন দেখিল অমল চারিদিক হইতেই শ্রদ্ধা পাইতেছে তখন সেও অমলের উচ্চ মস্তকের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল। অমলের তরুণ মুখে নব গৌরবের গর্বোজ্জ্বল দীপ্তি মন্দার চক্ষে মোহ আনিল।' সেই মোহে অমল নিজকে ধরা দিতে বাধ্য হইল। এদিকে তখন চারুর মনে ঈর্ষ্যার ছায়া ঘনাইতে আরম্ভ করিল। স্থির করিল, সেও সাহিত্য সৃষ্টি করিবে, এবং অমলকে দেখাইয়া দিবে, মন্দাকিনীর চেয়ে সে অনেক বড়, অনেক বেশী কাম্য। কিন্তু হইল বিপরীত। চারুর রচনা ও অমলের রচনা পাশাপাশি রাখিয়া কাগজে যে সমালোচনা বাহির হইল তাহাতে চারুরই হইল জয়, সমালোচক অমলকে নিন্দাবানে লাঞ্ছিত করিলেন। চারু ও অমলের ব্যবধান বাড়িয়াই গেল, এবং অমল ক্রমশ মন্দার দিকেই আরও ঝুঁকিয়া পড়িল। চারুর মনে একদিকে ব্যবধানের বেদনা, আর একদিকে ঈর্ষ্যার জ্বালা; এই দুইয়ের নিষ্পেষণে যখন তাহার সমস্ত হৃদয় মথিত ও ভারাক্রান্ত, তখন ভূপতির কর্মসমুদ্রে সংবাদপত্র তরণী টলমল করিয়া উঠিল মন্দার স্বামী উমাপদর চক্রান্তে। ম্লানমুখে চিন্তাভারাতুর হৃদয়ে বহুদিন পরে ভূপতি শান্তি খুঁজিতে আসিল স্ত্রী চারুর কাছে। কিন্তু চারু তখন 'নিজের দুঃখে সন্ধ্যাদীপ নিবাইয়া জানালার কাছে অন্ধকারে বসিয়াছিল।' ভূপতি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেল। ইতিমধ্যে মন্দা স্বামীকে লইয়া বিদায় হইয়া গেল। কিছুদিনের মধ্যেই ভূপতির সংবাদপত্র-তরণীও ভরাডুবি হইল। চারু তখনও নিজের দুঃখভারে অবনত, ভূপতির বিপদের দিকে দৃষ্টি দিবার মত হৃদয়ের অবস্থা তাহার নয়। কিন্তু সে বিপদ যে কত বড় এবং সেই বিপদ ও দায়িত্ব মাথায় লইয়া দাদা যে একা অসহায়ের

মতন নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছেন তাহা শুধু বুঝিল অমল। এক মুহূর্তে সে তাহার নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইল, নিজের কর্তব্যবোধে মাথা তুলিয়া জাগিয়া উঠিল, এবং হয়ত বা নিজের অতীতের দায়িত্বলেশহীন জীবনযাত্রার জন্য ব্যথিতও হইল। এমন সময় সুযোগ আসিল অমলের এক বিবাহের, এবং বিবাহের পরই শ্বশুরের খরচে বিলাত যাইবার। বিনা দ্বিধায় এবং বিনা বাক্যব্যয়ে অমল রাজী হইল, এবং বিবাহের পরই বিলাত চলিয়া গেল। তাহার প্রতিজ্ঞা, মানুষ হইয়া উঠিয়া দাদার বিপদের অংশ মাথায় লইতে হইবে। সে জানিলনা, বুঝিতেও পারিলনা, দাদার সুখ ও শান্তির নীড়টি ইতিমধ্যেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এদিকে চারু আশ্চর্য হইল, ব্যথিত হইল এই ভাবিয়া যে অমল এত সহজে বিবাহ করিতে রাজী হইল কি করিয়া, এত সহজে তাহাদের মধুর সম্বন্ধ ভুলিতে পারিল কি করিয়া, এবং তাহাকে একটি কথাও না বলিয়া একান্তভাবে চলিয়াই বা যাইতে পারিল কি করিয়া। 'নিজের হৃদয়-প্রাচুর্যের সহিত তুলনা করিয়া চারু অমলের শূন্য হৃদয়কে অত্যন্ত অবজ্ঞা করিতে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিলনা। ভিতরে ভিতরে নিয়ত একটা বেদনার উদ্বেগ তপ্তশূলের মত তাহার অভিমানকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া তুলিতে লাগিল।' চারু নিজে ভাবিয়াছিল, অমল চলিয়া যাওয়ার আগে তাহাদের এই ব্যবধান সে নিজেই ঘুচাইয়া ফেলিবে, কিন্তু 'বিদায় দিবার সময় চারুর মুখে কোনও কথাই বাহির হইল না। সে কেবল বলিল, চিঠি লিখ্‌বে ত অমল? অমল ভূমিতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল—চারু ছুটিয়া গিয়া শয়ন ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।' তারপর আরম্ভ হইল দিনের পর দিন নীরব ক্রন্দন। 'অবশেষে যতই দিন যাইতে লাগিল ততই অমলের অভাবে সংসারিক শূন্যতার পরিমাপ ক্রমাগতই যেন বাড়িতে লাগিল। এই ভীষণ আবিষ্কারে চারু হতবুদ্ধি হইয়া গেছে। * * *

এ মরুভূমির কথা সে কিছুই জানিত না।' * * * 'অবশেষে চারু একেবারে হাল ছাড়িয়া দিল—নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করায় ক্লান্ত হইল—হার মানিয়া নিজের অবস্থাকে অবিরোধে গ্রহণ করিল। অমলের স্মৃতিকে যত্নপূর্ব্বক হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইল। ক্রমে এম্‌নি হইয়া উঠিল, একাগ্রচিত্তে অমলের ধ্যান তাহার গোপন গর্বের বিষয় হইল—সেই স্মৃতিই যেন তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব।'

"গৃহকার্যের অবকাশে একটা সময় সে নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইল। সেই সময় নির্জ্জনে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া অমলের সহিত তাহার নিজ জীবনের প্রত্যেক ঘটনা চিন্তা করিত। উপুড় হইয়া পড়িয়া বালিশের উপর মুখ রাখিয়া বারবার করিয়া বলিত—অমল, অমল, অমল! সমুদ্র পার হইয়া যেন শব্দ আসিত—বৌঠান্, কি বৌঠান্! চারু সিক্ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিত—অমল তুমি রাগ করিয়া চলিয়া গেলে কেন? আমি তো কোনও দোষ করি নাই। তুমি যদি ভাল মুখে বিদায় লইয়া যাইতে, তাহা হইলে বোধ হয় আমি এত দুঃখ পাইতাম না। অমল সম্মুখে থাকিলে যেমন কথা হইত, চারু ঠিক তেমনি করিয়া কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া বলিত, অমল তোমাকে আমি একদিনও ভুলি নাই! একদিনও না, এক দণ্ডও না। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠপদার্থ সমস্ত তুমিই ফুটাইয়াছ, আমার জীবনের সারভাগ দিয়া প্রতিদিন তোমার পুজা করিব।

"এইরূপে চারু তাহার সমস্ত ঘরকন্না তাহার সমস্ত কর্ত্তব্যের অন্তঃপুরের তলদেশে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া সেই নিরালোক নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে অশ্রুমালা সজ্জিত একটি গোপন শোকের মন্দির নির্মাণ করিয়া রাখিল। সেখানে তাহার স্বামীর বা পৃথিবীর আর কাহারও কোনও অধিকার রহিল না। * * * তাহারই দ্বারে সে সংসারের সমস্ত ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজের অনাবৃত আত্মস্বরূপে প্রবেশ করে, এবং সেখান হইতে বাহির হইয়া মুখোশখানা আবার মুখে দিয়া পৃথিবীর হাস্যালাপ ও ক্রিয়াকর্মের রঙ্গভূমির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়।

"এই রূপে মনের সহিত দ্বন্দ্ববিবাদ ত্যাগ করিয়া চারু তাহার বৃহৎ বিষাদের মধ্যে একপ্রকার শান্তিলাভ করিল এবং একনিষ্ঠ হইয়া স্বামীকে ভক্তি ও যত্ন করিতে লাগিল। * * *"

কিন্তু বৃথাই চারুর এই চেষ্টা, বৃথাই এই সাধন-যোগ। এবং বৃথাই ভূপতির নানা উপায়ে নানা চেষ্টায় চারুকে অন্তরের মধ্যে একান্ত আপন করিয়া ধরিবার। মনের সঙ্গে লুকোচুরি করিয়া দিন কাটিয়া যায়; কিন্তু একদিন ভূপতি জানিল, সমস্ত বুদ্ধি ও চৈতন্য দিয়া বুঝিল তাহার নীড় নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আর তাহা জোড়া লাগিবে না। 'সংসার একেবারে তাহার কাছে শুষ্ক জীর্ণ হইয়া গেল।' কিন্তু সে কিছু বলিল না, কোলাহল করিল না, শুধু বুঝিতে চেষ্টা করিল। চারু আর একবার শেষ চেষ্টা হয়ত করিল, কিন্তু পরমুহূর্তেই বুঝিল, নষ্টনীড় আবার গড়িয়া তোলার চেষ্টা বৃথা।

গল্পটির কাঠামো অত্যন্ত শুষ্ক ও নীরস করিয়া উপরে বিবৃত করা হইল। যে সুচারু ও সুনিপুণ ঘটনা-সংস্থান এই অত্যন্ত সুকুমার, অসামাজিক ও অপ্রত্যাশিত পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে, যে সুকোমল হৃদয়বৃত্তির বিকাশ এই গল্পটির উপজীব্য তাহার পরিচয় এই বিবৃতির মধ্যে পাওয়া যাইবে না। তবু, এই পরিবেশ ও এই বিকাশের মূলে যে-যুক্তি আছে, তাহাকে এই নীরস সংক্ষিপ্ত বিবৃতির মধ্যে হয়ত ধরা যাইতে পারে। লেখক নিজের সুগভীর সহানুভূতির দ্বারা অন্তরের মধ্যে এই গল্পের যাহা অন্তর্নিহিত সত্য তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও জানেন, অমল ও চারুর মধ্যে যে সুকুমার সম্বন্ধ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়া শেষ পর্যন্ত চারু ও ভূপতির নীড় নষ্ট করিয়া দিল তাহা অসামাজিক, তাহা আমাদের চিরাচরিত সামাজিক সংস্কারকে আহত করে, প্রেমবিকাশের এই পরিবেশ আমাদের সামাজিক বুদ্ধি স্বীকার করে না। ভূপতি যেদিন আবিষ্কার করিল, তাহার নীড় চিরতরে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেদিন তাহার দুঃখ যে কত গভীর তাহাও লেখক জানেন, কিন্তু এই সত্যকে তিনি অস্বীকার করিতে পারেন না যে, ঘটনার যে পৌর্বাপর্যের ভিতর দিয়া অমল ও

চারুর বৎসরের পর বৎসর কাটিয়াছে, তাহাতে এই প্রেম-বিকাশ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, শুধু স্বাভাবিক নয়, বাস্তব জীবনে তাহা নিয়তই ঘটিয়া থাকে। লেখক ঘটনার পর ঘটনা, পরিবেশের পর পরিবেশ যেমন করিয়া সাজাইয়াছেন তাহাতে পাঠকের চিত্তে ও লেখকের উপলব্ধ সত্য শুধু যে নিকটতর হয় এমন নয়, সে-সত্যকে সে স্বীকার না করিয়া পারে না। কারণ, ঘটনা ও পরিবেশ লেখক যেমন করিয়া বিন্যাস করিয়াছেন তাহাতে তাহারা শুধু ঘটনা ও পরিবেশ মাত্র থাকে নাই, তাহারা হইয়া উঠিয়াছে একটি সুসম্বন্ধ যুক্তিমালা। এই দিক দিয়া গল্পটির কলাকৌশলের যথেষ্ট প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না; এবং এই ধরনের সমস্যামূলক গল্পে ও উপন্যাসে এই কলাকৌশলই প্রধান বস্তু যাহার বলে সমস্যাগত সত্য সাহিত্যের স্তরে উন্নীত হয়। সমস্যাগত সত্যকে তর্ক করিয়া কবি অথবা লেখক যখন পাঠক-চিত্তের নিকটতর করিতে চাহেন তখন তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য; আমাদের সাহিত্যে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু ঘটনা ও পরিবেশ এমন সুচারু, সুনিপুণভাবে বিন্যাস করা যাইতে পারে যাহার ফলে সমস্যার অন্তর্নিহিত সত্য যুক্তি-শৃঙ্খলায় মীমাংসিত সত্যের রূপ ধরিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, যেমন হইয়াছে 'নষ্টনীড়ে', তখন আমাদের সমাজবুদ্ধি ও সংস্কার আহত হইলেও সত্যকে আর অস্বীকার করিতে পারি না, চারু অথবা অমল কাহাকেও সমর্থন করিতে না পারিলেও তাহাদের সম্বন্ধকে অস্বাভাবিক বলিতে পারি না, সমাজ স্বীকার না করিলেও মন সমস্তই স্বীকার করিয়া লয়। তখন আমরা চারু অথবা ভূপতি কাহারও দুঃখেই ব্যথিত না হইয়া পারি না, কে কতটুকু দায়ী সে বিচার তখন একান্ত অবান্তর। এবং, সমাজনীতি কতটা পীড়িত হইয়াছে বা হয় নাই, তাহাও অবান্তর।

'নষ্টনীড়' গল্পটি উপলক্ষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের মনের ক্রম-পরিবর্তনও

লক্ষ্য করিবার। কি কাব্য রচনায়, কি গল্প উপন্যাস রচনায়, এপর্যন্ত সর্বত্রই আমরা দেখিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধি, চিন্তা ও কল্পনা আমাদের চিরাচরিত সংস্কার, শতাব্দী-সঞ্চারিত ধ্যান-ধারণা, ধর্ম ও সমাজবোধ, এমন কি প্রচলিত সৌন্দর্যবোধকেও খুব অতিক্রম করিয়া যায় নাই। এসব সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন এপর্যন্ত কবির মনে জাগে নাই। এক কথায় তিনি আমাদের সংস্কার ও পরিবেশ, ঐতিহ্য ও আবেষ্টন, সমাজ ও রাষ্ট্র সব কিছু স্বীকার করিয়া লইয়াই এযাবৎ সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু, এই স্বীকৃতি সজ্ঞান স্বীকৃতি নয়, কার্যকারণ বিচার-লব্ধ নয়, একান্তই সহজ সংস্কারগত। এই সহজ সংস্কারই বহুদিন তাঁহার সৌন্দর্য সৃষ্টির মূলে প্রেরণা জোগাইয়াছে, বিশেষ করিয়া কাব্যে ও ছোটগল্পে। কিন্তু সহজ প্রেম ও সৌন্দর্যতন্ময়, গীতিমাধুর্যময় জীবনে একদিন প্রশ্ন ও সংশয়ের দ্বিধা জাগিল, "কল্পনা"-গ্রন্থ হইতেই তাহার সূচনা লক্ষ্য করা যায়; গভীর মহাজীবনের ইঙ্গিত "নৈবেদ্য-খেয়া" পর্যায়ে সুপরিস্ফুট। একদিকে এই নবজাগ্রত দ্বিধা সংশয় যেমন তাহাকে জীবনের গভীরতার দিকে আহ্বান করিতেছে, অন্যদিকে এই দ্বিধা সংশয়ই তাঁহাকে আমাদের সামাজিক সংস্কার ও ঐতিহ্যের কার্য-কারণ সম্বন্ধের মূল নির্ণয়ে প্রবৃত্ত করিতেছে। তাহার প্রথম পরিচয় আমরা পাইলাম 'নষ্টনীড়' গল্পে। এই গল্পেই আমরা প্রথম সুস্পষ্ট আভাস পাইলাম একান্ত ভাবধর্মী রবীন্দ্র-কবিচিত্তে যুক্তিধর্মের স্পর্শ লাগিয়াছে। কাব্যে এবং ছোট গল্পেও ইহার বিকাশ আমরা দেখিব আরও অনেক পরে,—"বলাকা"য়, "পলাতকা"য়, 'স্ত্রীর পত্র', 'পাত্র ও পাত্রী', 'পয়লা নম্বর', 'নামঞ্জুর' প্রভৃতি গল্পে, "চতুরঙ্গ" "ঘরে বাইরে" প্রভৃতি উপন্যাসে। এই সব কাব্য, গল্প ও উপন্যাসে লেখকের যে সমাজবোধ ও বুদ্ধি আমরা প্রত্যক্ষ করি, সমাজ-সত্তা সম্বন্ধে যে চেতনা লেখকের এই সাহিত্য-সৃষ্টিকে নূতন ভাব ও দৃষ্টি দান করিল, বাংলা-

সাহিত্যে এই সামাজিকচেতনা, কার্যকরণ-জ্ঞানলব্ধ সমাজবোধ ও বুদ্ধি আমরা এতকাল লক্ষ্য করি নাই। এই নূতন ভঙ্গি ও দৃষ্টিই রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক জগতের সীমার মধ্যে আনিয়া পৌঁছাইয়াছে; এবং ইহার বলেই তিনি আধুনিক সাহিত্য-স্রষ্টাদের মধ্যে আসন গ্রহণ করিয়াছেন।

এই সামাজিক চেতনা, কার্যকারণ-জ্ঞানলব্ধ সমাজবোধ রবীন্দ্রনাথের মনে হঠাৎ জাগে নাই।

বঙ্গাব্দ চতুর্দশ শতকের প্রথম দশকের শেষাশেষি হইতেই বাংলা দেশে একটা নবজীবনের সাড়া জাগিতেছিল; বাঙালী জীবনে শতাব্দী ধরিয়া যে গ্লানি ও অপমান, যে দুঃসহ বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল তাহা একদিন বঙ্গচ্ছেদের নির্মম আদেশকে উপলক্ষ করিয়া দেশের উপর ভাঙিয়া পড়িল—এক মুহূর্তে দেশের মূর্তি বদলাইয়া গেল। শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র সর্ববিষয়ে যেন দেশ সচেতন হইয়া উঠিল, একটা প্রবল ভাবোন্মাদনায় দেশ মাতিয়া উঠিল, এবং সে-উন্মাদনা ভাষা পাইল রবীন্দ্রনাথের গানে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায়। বাংলা দেশের সেই কয় বৎসরের ইতিহাস যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই একথা বলিবেন, রবীন্দ্রনাথই ছিলেন এই স্বদেশী-যজ্ঞের উদ্‌গাতা। এই সময়কার রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাদির বিষয় হইতেছে আমাদের শিক্ষা, আমাদের সমাজ, আমাদের ধর্ম, আমাদের রাষ্ট্র, আমাদের জীবনাদর্শ। অর্থাৎ আমাদের স্বদেশ ও স্বাজাত্যবোধ জাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই কবি একেবারে তাহাদের মর্মমূলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলেন, এবং তাহা হইতেই জাগিল প্রশ্ন, সংশয়, লাভ হইল কার্যকারণ বিচারসাপেক্ষ জ্ঞান। অথচ, আশ্চর্য এই, সঙ্গে সঙ্গে তখন লিখিতেছেন "খেয়া"-গ্রন্থের কবিতা।

"খেয়া"র কবি তাঁহার স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করিলেন "গীতাঞ্জলি-

গীতিমাল্য-গীতালি"তে। ইতিমধ্যে য়ুরোপে মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়া গেল, কবি নোবেল পুরস্কার পাইলেন, পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হইল, মহাযুদ্ধ-পরবর্তী য়ুরোপের নূতন সামাজিক চেতনা তিনি স্বচক্ষে দেখিলেন এবং তাহার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিলেন। বাহিরের জগতে ও জীবনে একটা মহাপরিবর্তন এই কয় বৎসরের মধ্যে সাধিত হইয়া গেল; কবিচিত্তে কি তাহার স্পর্শ লাগিল না? বোধ হয় ভাল করিয়াই লাগিল, গভীর ভাবেই লাগিল। তাহার ফলেই ত আমরা পাইলাম "বলাকা", "পলাতকা", পাইলাম "চতুরঙ্গ", "ঘরে বাইরে"; পাইলাম 'স্ত্রীর পত্র' পাত্র ও পাত্রী', 'পয়লা নম্বর' প্রভৃতি গল্প।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি পত্রাকারেই লিখিত, স্বামীর নিকট স্ত্রীর পত্র। আমাদের সমাজে নারীর কোনও মূল্য ছিল না এ কথা বলা চলে না; কন্যা হিসাবে, স্ত্রী হিসাবে, মা হিসাবে নারীর প্রতি একটি রোম্যান্টিক দৃষ্টি ও তজ্জনিত প্রীতি এবং শ্রদ্ধাও ছিল, কিন্তু পারিবারিক সম্পর্ক নিরপেক্ষ নারী হিসাবে নারীর মূল্য কিছুই ছিল না; শুধু আমাদের দেশে নয়, কোনও দেশেই ছিল না। এই নারীর মূল্য অপেক্ষাকৃত বর্তমান যুগের আবিষ্কার, আর্থিক ও সামাজিক বিবর্তনের ফল। য়ুরোপে এবং অন্যান্য পাশ্চাত্যদেশে এই ফল, এই আবিষ্কারের সূচনা দেখা দিয়াছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই, কিন্তু তাহার প্রকাশ দেখা গেল সে-শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে এবং পূর্ণতার বিকাশ আমরা দেখিলাম মহাযুদ্ধের পর। সে ঢেউ যে আমাদের নিস্তরঙ্গ সমুদ্রতটে আসিয়া লাগিল তাহার প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল 'স্ত্রীর পত্রে'।

'স্ত্রীর পত্র' প্রকাশিত হইয়াছিল "সবুজপত্র" মাসিক-পত্রিকায় (শ্রাবণ, ১৩২১)। আমাদের পুরাতন জীর্ণ সংস্কারের বিরুদ্ধে "বলাকা"র

কবিতায় যে-বিদ্রোহ ধ্বনিত হইতেছিল, তাহারই সুর ধরা পড়িল এই গল্পেও। নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের আভাস 'হৈমন্তী' গল্পেও আছে কিন্তু 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে স্বামিচরণতলাশ্রয়চ্ছিন্ন মৃণাল স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিল,

"আমি তোমাদের মেজ বৌ। আজ পনের বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেচি, আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে। * * * [বিন্দুর] ভালবাসার ভিতর দিয়ে আমি আপনার একটি স্বরূপ দেখলুম, যা আমি জীবনে আর কোনও দিন দেখিনি! সেই আমার মুক্তস্বরূপ। * * * আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেচি! সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কি তা আমি পেয়েচি। আমার আর দরকার নেই। * * * [বিন্দুর] উপরে তোমাদের যত জোরই থাকনা কেন, সে জোরের অন্ত আছে। ও আপনার হতভাগ্য মানব জন্মের চেয়ে বড়। তোমরাই যে আপন ইচ্ছামত আপন দপ্তর দিয়ে ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে তোমাদের পা এত লম্বা নয়। মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান্—সেখানে বিন্দু কেবল বাঙালী ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খুড়তুতো ভা'য়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়, সেখানে সে অনন্ত। তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করিনে। আমার সমুখে আজ নীল সমুদ্র। আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ। তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিলে। ক্ষণকালের জন্য বিন্দু এসে সেই আবরণের ছিদ্র দিয়ে আমায় দেখে নিয়েছিল। সেই মেয়েটাই তার আপনার মৃত্যু দিয়ে আমার আবরণখানা আগাগোড়া ছিন্ন করে দিয়ে গেল। আজ বাইরে এসে দেখি আমার গৌরব রাখবার জায়গা নেই। আমার এই অনাবৃত রূপ যাঁর চোখে ভাল লেগেছে, সেই সুন্দর আকাশ দিয়ে আমাকে চেয়ে দেখচেন। এইবার মরেচে মেজ-বৌ। * * * আমিও বাঁচবো। আমি বাঁচলুম।"

কোথায় গেল সেই সুকুমার গীতিমাধুর্য, ভাব-কল্পনার লীলা যাহা ছিল রবীন্দ্র-ছোটগল্পের প্রাণ? এ যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণজর্জরিত জীবন-

সমস্যা, এ যে তীব্র কণ্টকিত আঘাত; এ যে চিন্তাবৃন্তের মূল ধরিয়া টান, সমাজ-ব্যবস্থার মূল সম্বন্ধে শুধু প্রশ্নমাত্র নয়, তাহাকে একেবারে অস্বীকার করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা! 'নষ্টনীড়' গল্পের কলাকৌশলের নিপুণতা 'স্ত্রীর পত্রে' নাই। মৃণালের বক্তব্য এক পক্ষীয়, যুক্তি-শৃঙ্খলাও তেমন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে নাই। কিন্তু যুক্তি-শৃঙ্খলার অভাব পূরণ করিয়াছে জীবন-সমস্যার সত্য, এবং মৃণালের নারী-স্বাতন্ত্র্যের আদর্শের বিকাশ যে-ভাবে হইয়াছে তাহাতে ঢাকা পড়িয়াছে গল্পটির আদর্শ প্রচারের ভঙ্গি।

'স্ত্রীর পত্রে'র বিদ্রূপবাণ ব্যর্থ যায় নাই। প্রমাণ, "নারায়ণ" মাসিক পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের 'মৃণালের পত্র' এবং ললিত-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'স্বামীর পত্র' নামক দুই প্রতিবাদ। প্রমাণ, পরবর্তী যুগের সাহিত্যে, সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর বিদ্রোহবাণী।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পে মৃণাল নারীত্বের যে-মহিমা ঘোষণা করিল তাহারই প্রতিধ্বনি আমরা শুনি "পলাতকা"র 'মুক্তি' নামক কবিতায়; সেখানে বাইশ বৎসর বিবাহিত জীবন যাপনের পর দীর্ঘ অসুখের ছল করিয়া মৃত্যু যখন একটি অবহেলিত একটি মেয়ের জীবনে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, তখন সেই মেয়েটির হেলাফেলার জীবনে প্রথম বসন্ত দেখা দিল, নারীত্বের পরিপূর্ণ মহিমার আভাস যেন সে পাইল:

প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে
বসন্তকাল এসেছে মোর ঘরে।
জাম্‌লা দিয়ে চেয়ে আকাশ পানে
আনন্দে আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠছে প্রাণে—
আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না-বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।

তুচ্ছ বাইশ বছর আমার ঘরের কোণে ধুলায় পড়ে থাক
মরণ বাসর ঘরে আমায় যে দিয়েছে ডাক
দ্বারে আমার প্রার্থী সে যে, নয় সে কেবল প্রভু
হেলা আমায় করবেনা সে কভু।
চায় সে আমার কাছে
আমার মাঝে গভীর গোপন যে-সুধারস আছে।
গ্রহতারার সভার মাঝখানে সে
ঐ যে আমার মুখে চেয়ে দাঁড়িয়ে হোথায় রইল নির্নিমেষে।
মধুর ভুবন, মধুর আমি নারী
মধুর মরণ, ওগো আমার অনন্ত ভিখারী!
দাও খুলে দাও দ্বার
ব্যর্থ বাইশ বছর হতে পার করে দাও কালের পারাবার।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পেও এই একই কথা। মৃণাল নারীত্বের পূর্ণ মহিমা উপলব্ধি করিল বিন্দুর অবজ্ঞাত বঞ্চিত জীবন ও মৃত্যুর ভিতর দিয়া, আর 'মুক্তি' কবিতার মেয়েটি সেই মহিমাকেই জানিল নিজেরই বঞ্চিত জীবনের শেষ অধ্যায়ে মৃত্যু-দূতের আহ্বান পাইয়া। নারীত্বের প্রতি আমাদের রোম্যান্টিক প্রেম ও শ্রদ্ধার অন্তরালে যে বৃহৎ বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা আত্মগোপন করিয়া আছে, 'স্ত্রীর পত্র' গল্প ও 'মুক্তি' কবিতা আমাদের সেই সামাজিক প্রবঞ্চনাকে গোপনতা হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছে।

'পয়লা নম্বর' (১৩২৪) গল্পটি আপাত-দৃষ্টিতে দাম্পত্য-সম্বন্ধের বিশ্লেষণ চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়, কিন্তু ইহার আর একটি গভীরতার দিক আছে, সেটি ইহার সামাজিক চেতনার দিক। অদ্বৈতচরণ একাগ্র জ্ঞানান্বেষী চিন্তাবিলাসী যুবক, সংসারানভিজ্ঞ ও অন্যমনস্কচিত্ত। সে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর নিজের বন্ধু-মণ্ডলীর পরিবেশের মধ্যে জ্ঞানানুশীলনে ব্যাপৃত। সে জগতের মধ্যে

তাহার স্ত্রী অনিলার কোনও স্থান ছিল না, এবং অদ্বৈতচরণও নিশ্চিন্ত ছিল এই ভাবিয়া যে পুরোহিতের কাছ হইতে যখন একজনকে স্ত্রী বলিয়া পাওয়া গিয়াছে তখন সে নিশ্চয়ই আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। ইহার চেয়ে স্ত্রী সম্বন্ধে বেশি কিছু ভাবিবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু অনিলার হৃদয় ছিল, এবং সে হৃদয় সজীব পদার্থ। এই সজীব পদার্থটির জগৎ ক্ষুদ্র হইলেও সেখানে ঘাত-প্রতিঘাতের অভাব ছিল না, এবং সেই ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া একটি ক্ষুব্ধ নারী হৃদয় গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছিল। অদ্বৈতচরণ তাহার কিছুই বুঝিতে পারে নাই; বুঝিবার প্রয়োজনও বোধ করে নাই। এমন সময় সিতাংশুমৌলির আবির্ভাব, যে-সিতাংশুর হৃদয়াবেগের প্রাচুর্য তাহার সাংসারিক ঐশ্বর্যের চেয়ে কম নয়। অদ্বৈতচরণ যাহা কখনও দেখে নাই বুঝে নাই, সিতাংশু তাহা দেখিল এবং বুঝিল; সে দেখিল অন্তরের দিক হইতে অনিলার বেদনা কত বড়, কত গভীর। সিতাংশুর সমস্ত হৃদয় নিংড়াইয়া এই কথা উচ্চারিত হইল—

"আমি তোমাকে দেখেছি। এতদিন এই পৃথিবীতে চোখ মেলে বেড়াচ্ছি, দেখবার মত দেখা আমার জীবনে এই বত্রিশ বছর বয়সে প্রথম ঘটলো। চোখের উপর ঘুমের পর্দা টানা ছিল; তুমি সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছ। আজ আমি নব জাগরণের ভিতর দিয়ে তোমাকে দেখলুম, যে-তুমি তোমার সৃষ্টিকর্তার পরম বিস্ময়ের ধন সেই অনির্বচনীয় তোমাকে। আমার যা পাবার আমি তা পেয়েছি, আর কিছু চাইনে, কেবল তোমার স্তব তোমাকে শোনাতে চাই।"

এই স্তব শুনাইয়া অনিলার চিত্ত সে জয় করিল; অনিলার নিকট হইতে কোনও সাড়া সে পাইল না; কিন্তু তাহার বিদ্রোহ-ধূমায়িত হৃদয়ে আগুন ধরাইয়া তাহাকে সে গৃহছাড়া করিল। অনিলা অদ্বৈতর গৃহ ছাড়িল, সিতাংশুর গৃহেও গেল না। জ্ঞানগর্বিত অদ্বৈতচরণ প্রথম ধাক্কাটা সামলাইয়া লইবার পর ব্যাপারটাকে খুব সহজভাবে দেখিতে চেষ্টা করিল। 'যুগ যুগান্তরের জন্মমৃত্যুকে

অতিক্রম ক'রে টিঁকে রয়েছে এমন সব জিনিসকে আমি কি চিনতে শিখিনি ?'

"কিন্তু হঠাৎ দেখলুম এই আঘাতে আমার মধ্যে নব্যকালের জ্ঞানীটা মূর্ছিত হয়ে পড়লো আর কোন আদিকালের প্রাণীটা জেগে উঠে ক্ষুধায় কেঁদে বেড়াতে লাগলো।"

এ যেন "চতুরঙ্গ"-গ্রন্থের সেই 'আদিম জন্তুটা'! তারপর রেশমের লাল ফিতায় বাঁধা সিতাংশুর লেখা চিঠির তাড়া যখন পড়া শেষ হইল তখন সে নিজেকে এই বলিয়া প্রবোধ দিল—

"সিতাংশু যাকে ক্ষণকালের ফাঁক দিয়ে দেখেছে আজ আট বছরের ঘনিষ্ঠতার পর এই পরের চিঠিগুলির ভিতর দিয়ে তাকে প্রথম দেখলুম। আমার চোখের ঘুমের পর্দা কত মোটা পর্দা না জানি! পুরোহিতের হাত থেকে অনিলাকে আমি চেয়েছিলুম, কিন্তু তার বিধাতার হাত থেকে হাত গ্রহণ করবার মূল্য আমি কিছুই দিইনি। আমি আমার দ্বৈতদলকে এবং নব্যন্যায়কে তার চেয়ে অনেক বড় করে দেখেছি। সুতরাং যাকে আমি কোন দিনই দেখিনি, এক নিমিষের জন্যেও পাইনি, তাকে আর কেউ যদি আপনার জীবন উৎসর্গ করে পেয়ে থাকে তবে কি ব'লে কার কাছে আমার ক্ষতির নালিশ করবো ?"

কিন্তু প্রশ্ন থাকিয়া যায়, সেই আদিকালের প্রাণীটা এই প্রবোধে সান্ত্বনা মানিল কি ? লেখকের রচনায় কার্যকারণ বিচারলব্ধ জ্ঞান জয়ী হইয়াছে, যুক্তিশৃঙ্খলা অনুসরণ করিয়া পাঠক অদ্বৈতচরণের আত্ম-প্রবোধকে স্বীকার না করিয়া পারিবেন না। কিন্তু আদিকালের প্রাণীটার ক্ষুধা নিবৃত্তি লাভ করিবে কি ?

গল্প হিসাবে 'পাত্র ও পাত্রী' (১৩২৪) খুব সার্থক রচনা নয়। আমাদের সমাজে বিবাহ ব্যাপারে পুরুষ নারীর প্রতি কিরূপ নির্মম ও অপৌরুষেয় ব্যবহার করিয়া থাকে, মানবতার দাবি ও যুক্তিকে কি নির্দয়ভাবে পীড়িত করিয়া থাকে তাহারই কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্তে গল্পটি গাঁথা। তাহাদের মধ্যে রস ও রূপবন্ধনের কোনও নিবিড় ঐক্য